বাংলা টাউন সমাচার-২

মোল্লা বাহাউদ্দিন

টরন্টো শহরে ড্যানফোর্থ এভিনিউ খুব পরিচিত একটি রাজপথ। পশ্চিমে ডন রিভার ভেলি থেকে শুরু হয়ে পুবে দশ কিলোমিটার গিয়ে কিংস্টোনে মিশেছে। এই রাজপথের কাজ শুরু করেছিল ১৭৯৯ সালে আমেরিকান কোম্পানী ডন এন্ড ড্যানফোর্থ প্লাঙ্ক রোড কোম্পানী। ১৮৫১ সালে এর কাজ সম্পুর্ন হয়। কন্ট্রাকর আসা ড্যানফোর্থের নামে এর নামকরন করা হয় ড্যানফোর্থ এভিনিউ। ড্যানফোর্থের আকর্ষন গ্রীক টাউন, ওয়ার মেমোরিয়েল, এবং সর্বশেষ আকর্ষন বাংলা টাউন। মেইন স্ট্রিট থেকে ফার্মেসী এভিনিউ পর্যন্ত অনেকগুলো আকাশচুম্বি অট্টালিকা। হাজার হাজার মানুষের বাস। হাটার দুরত্বে সাবওয়ে, স্কুল, ডাক্তারখানা এবং মল-সুপারমার্কেট ইত্যাদি সুযোগ সুবিধাগুলো মানুষকে এখানে বসতির জন্য আকর্ষন করে।

এই আকর্ষনে বাঙালিও ঘর বাধা শুরু করে এসব অট্টালিকায়। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে বাঙালির সংখ্যা। বাড়তে থাকে কাজকর্মের সুযোগ সুবিধা। যারা ব্যবসায়ী তারা ভাবতে থাকেন ব্যবসার কথা। ধীরে ধীরে গড়ে উঠে বাঙালি ব্যবসা। এখন বাঙালি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিধি বেড়ে মেইন স্ট্রিট থেকে ড্যানফোর্থ রোড পর্যন্ত দখল করে নিচ্ছে। প্রায় সব ধরনের ব্যবসাই এই বাংলা টাউনে এখন প্রতিষ্ঠিত। এটা আমাদের উন্নতির লক্ষন।

গ্রীক টাউনের দিকে যখন তাকাই তখন দেখতে পাই তাদের ব্যবসা রমরমা। তারা একে অপরকে সহযোগিতা করে, সামাজিকভাবে এবং ব্যবসায়ীক কাজকর্মে। তাদের এতসব সংগঠন নেই। সভাসমিতি নেই, তারা ব্যস্ত নিজেদের ব্যবসা নিয়ে। তাই টেষ্ট অব ড্যানফোর্থ এখন টরন্টোবাসীর খুব পরিচিত নাম। বাংলা টাউন এখনও সেরকম কোন ব্যবসায় নাম কুড়াতে পারেনি। কারন আমাদের ব্যবসার বয়স খুব বেশিদিনের নয়। তবে আমরা আশা করব এমন কোন ব্যবসায় আমরাও পরিচিত হব টরন্টোবাসীর কাছে।

বাংলা টাউন গড়ার পেছনে যাদের অবদান তাদের অনেকে হয়ত আর ড্যানফোর্থে নেই। কিন্তু তাদের কর্মফল রয়ে গেছে। তারা আমাদের দিশারি। এই ড্যানফোর্থ বুকে ধারন করে আছে অনেক গল্প কাহিনী, নীরব সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে বাংলা টাউনের অনেক ক্রিয়াকর্মের। অনেক উত্থান পতন, ভাংগা গড়া আর জয় পরাজয়ের সাক্ষী ড্যানফোর্থ। তাই বার বার ফিরে ফিরে আসতে হবে বাংলা টাউনে। সন্ধান করব বাংলা টাউনের গোড়াপত্তনে যাঁদের দান সেই সব অগ্রপথিকের পরিচয় এবং ক্রিয়াকর্ম।

সন্ধান করে যতটুকু বের করা গেছে তা হলো বাংলা টাউন গড়ার অগ্রপথিক হলেন জনাব জগলুল হক এবং তাঁর দুজন অংশিদার ইকবাল হোসেন বাবুল ও সাদিকুর রহমান। ১৯৯২ সালে ড্যানফোর্থে প্রথম গ্রোসারি শুরু করেন এই তিন মহাজন। ড্যানফোর্থ এবং ডজ রোডের কোনে আল আমীন গ্রোসারি নামে একমাত্র এই গ্রোসারি ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত গ্রাহকের চাহিদা পুরন করে। ১৯৯৫ সালে নানা কারনে বন্ধ হয়ে যায়।
আল আমিন চালু থাকা কালে রতন ইঞ্জিনিয়ারের মালীকাধিন চালু হয় বাংলা বাজার নামে আর একটি গ্রোসারি।
তারপর আসে সোনার বাংলা গ্রোসারি
বাংলাদেশ গ্রোসারি
বাংলা বাজার গ্রোসারি
প্রবাসী যা এখন শাহজালাল গ্রোসারি।
দৈনিক বাংলা গ্রোসারি
দৈনিক বাজার
গ্রীন ঘর
সরকার ফুডস
ধানসিড়ি
মারহাবা সুপার মার্কেট
বেঙ্গাল সুপার মার্কেট
আলআমিন সুপার বাজার ইত্যাদি আরো অনেক গ্রোসারি শুরু হয় আমাদের রসনা পরিতৃপ্ত করার প্রয়োজনে।
এসব গ্রোসারির বেশ কিছু এবং অন্যান্য অনেকগুলো ব্যবসা এখন হারিয়ে গেছে কিন্তু বাংলা টাউন প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য। গ্রোসারি নিয়ে কথা উঠলে উপরোক্তভাবে একটা লিস্ট করা যায়। কিন্তু ব্যবসা শুরুর দিক থেকে আলআমিন গ্রোসারির পরই নাম আসে প্রিয়াঞ্জান, মানি এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি। মানি এক্সচেজ্ঞের প্রথম শুরু করেন সারওয়ার এবং আশরাফ সাহেব। প্রিয়াঞ্জানের প্রতিষ্ঠাতা জনাব হাসানুর রশিদ ফরহাদ এবং সৈয়দ সামসুল আলম যৌথ মালিকানায়। তাদের মাঝে ফরহাদ ভাইর অবদান বেশি মানে তিনি বেশিদিন কোন ব্যবসাতেই স্থিতি লাভ করেননি।

ধৈর্য্য আমার মত। প্রিয়াঙ্গানের পর তিনি শুরু করেন কফি কর্নার যা এখন একটা জুয়েলারি। সেটা বাদ দিয়ে তিনি শুরু করেন ঢাকা কনভিনিয়েন্ট। এখনও বহাল আছে তবে অন্য মালিকাধিন। তারপর তিনি শুরু করেন আলাউদ্দিন রেস্টুরেন্ট। তাও বেশিদিন চালাতে পারেননি বা ধৈর্য্য রাখতে পারেননি। তারপর অনেকদিন নীরব ছিলেন। ইদানিং খুব জমজমাটভাবে শুরু করেছেন আনন্দ রেস্টুরেন্ট। এবার আশা করি চালিয়ে যাবেন। তিনি শুরু করেছেন অনেকগুলো ব্যবসা কিন্তু স্থিতিলাভ করেননি। এই ব্যবসাগুলো এখনও চালু আছে।

এমনিভাবে দিনে দিনে একে একে করে গড়ে উঠেছে বাংলা টাউন। এখন বাংলা টাউনে নেই এমন কোন ব্যবসা নেই। বেশ কয়েকটা রেস্টুরেন্ট, ফার্স্ট ফুড, মানি এক্সচেঞ্জ, বাংলা বইএর দোকান, সবগুলো সাপ্তাহিক কাগজের অফিস, ফার্নিচার, ভিডিও অডিওর দোকান, কম্পিউটার ব্যবসা, একাউন্টিং, ট্রেভেল এজেন্সি ইত্যাদি। নেই কী?

নবাগতরা শহরে পদার্পন করেই খোজ নেয় বাঙালি ঘন বসতি কোথায় এবং এর ধারে কাছেই নিজেদের ঠিকানা খোজে নেয়। বাঙালি বাঙালির কাছেই থাকতে চায়। একসাথে চলতে গেলে ঠোনাঠুনি হয়, ঝগড়াঝাটি হয় তারপরও বাঙালি বাঙালির কাছেই থাকে। কৃচিত দুএকজন আছে যারা নিজেদেরকে আলাদা করে রাখে। তারা দল ছাড়া। এখন এই ড্যানফোর্থ এলাকায় সবচেয়ে বেশি বাঙালির বসবাস। আকাশচুম্বি অট্টালিকায় তো দখল করে আছেই, আশেপাশের বাড়ীঘরও কিনে নিজেদের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে। হাটার দুরত্বে বাংলা টাউন। যখন ইচ্ছে একটা চক্কর দেয়া যায়। অনেকেই আছেন যারা দৈনিক একবার বাংলা টাউনে না গেলে ঘুম হয় না। তাদের পেটের ভাত হজম হয় না।

কিসের আকর্ষনে অন্তত একবার বাঙলা টাউনে মানুষ আসে? শুধু কেনা কাটা নয়, এখানে আসলে অনেকের সাথে দেখা হয়, খবর আদান প্রদান হয়, গল্প হয়। মন খোলে গল্প করতে হলে চাই আর একজন বাঙালি। বাংলায় গল্প করতে না পারলে গল্পের আসল মজাই তো পাওয়া যায় না। তাও যদি বন্ধুবান্ধব হয় তাহলে তো কথাই নেই। গল্পে মজে যায়। যতক্ষন গল্প চলে ততক্ষন পৃথিবীর আর সব কাজকর্ম দু:খ ব্যাথা ভুলে থাকা যায়। এখানে সবাই যে সবদিক দিয়ে সুখি তা বলা যায় না। কম বেশি দু:খ ব্যাথা থাকবেই। যতক্ষন বাংলা টাউনে ঘুরাঘুরি বা আড্ডায় মশগুল থাকে ততক্ষন অন্য জগতে থাকে। সর্বকিছুই ভুলে থাকে। এই বাংলা টাউন বাঙালির মিলন কেন্দ্র। শীত গ্রীষ্ম সব সময় বাংলা টাউন থাকে জমজমাট।

বাঙালি ভোজনবিলাসী। ভোজনের সম্পুর্ন তৃপ্তি পেতে হলে চাই বাংলাদেশের মাছ তরিতরকারি। বাংলা টাউনে অনেকগুলো গ্রোসারি সেসব চাহিতা মিটায়। তাই এখানে বাঙালির ভীড় সব সময় লক্ষ করা যায়।

তবে এসব খাদ্যবিলাস আমাদের জন্যই। এই আমরা যারা স্বাধীনতার পর টগবগে রক্ত নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলাম। এখন সবাই প্রায় বৃদ্ধের কোঠায়। আমরা নষ্টালজিয়ায় ভোগি। বসবাস করি এই দেশে কিন্তু মন পড়ে থাকে বাংলার আনাচে কানাচে। বাংলাদেশের অভাবটা যেন এই ড্যানফোর্থ কিছুটা মিটায়। কিন্তু আমাদের সন্তানরা, যারা এখানে বড় হচ্ছে, তারা তার ধারে কাছেও নেই। বাংলাদেশের প্রতি তাদের কোন পিছুটান নেই, বাঙালি খাদ্যের প্রতিও খুব একটা আগ্রহ নেই।

এই মিলন কেন্দ্রে বর্তমান প্রজন্মের আমরাই শুধু এখানে মিলতে এসে আনন্দ পাই। মিলতে এসে কখনও অমিলও হয়ে যায়। আবার মিল হয়। কখনও ঝগড়া হয়। বেশিক্ষন থাকেনা। মিটে যায়। কিন্তু কিছু ঘটনা বা কর্মের দাগ থেকে যায়। সে দাগগুলো সম্পুর্ন মুছে ফেলার কোন পথ এখনও খুজে পাওয়া যায়নি।

নোট:

যেসব অগ্রপথিকের নাম, প্রতিস্টানের নাম, কখন শুরু এবং কোথায় এসব তথ্য আহরন করতে হয়েছে অনেকের সাথে যোগাযোগ করে। যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন, জনাব আব্দুর রাজ্জাক, সৈয়দ সামসুল আলম এবং হাসানুর রশিদ ফরহাদ। এসব তথ্যে হয়ত ভুল থাকতে পারে। যতি কেউ আরও কিছু জানেন বা যোগ বিয়োগ করতে চান তাহলে পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ বা ইমেইল করে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

ত্যাগ

বঙ্গা শার্দুলের একটি গল্প

সন্ধ্যানে বেরিয়েছিলাম। বাংলা টাউন প্রতিষ্ঠায় অগ্রপথিকের। দেখা হয়ে গেল রহমান ভাইর সাথে। যদিও তিনি ব্যবসার সাথে জড়িত নন বা বাংলা টাউন প্রতিষ্টায় কোন অবদান আছে বলে জানা নেই। বাংলা টাউনে দেখা বলেই লিখতে হল। শুনেছিলাম তিনি খুব অসুস্থ। প্রশ্ন ছিল বাঁচবেন তো? কারন দুটো কিডনীই নেই। এখন দেখি তিনি রানিং সুট পরা অবস্থায় বাংলা টাউনের গ্রোসারি থেকে ধনে পাতা, কাচা মরিচ আর কেচকী মাছ নিচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন?
খুব ভাল আছি। দৈনিক এক ঘন্টা দৌড়াই। এইত দৌড়ানো শেষ হল, বাসায় যাব। বেশি করে কাচামরিচ দিয়ে কেচকী রান্না হবে, লেবু দিয়ে গরম গরম ভাত খাব। এখন আর কোন সমস্যা নেই। শরীর খুব ভাল আছে। ডায়লুসিসএর উপর আর বেচেঁ থাকতে হবে না।
এই পরিবর্তনের শানে নজুলটা কি বলুন শুনি।
তিনি তার কাহিনী বললেন।

স্বাধীনতার পর বাংলার যুবকদের মাঝে বিদেশে পাড়ি দেবার একটা প্রবনতা জেগে উঠে। টগবগে রক্ত নিয়ে দুরের হাতছানিতে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল অনেক দামাল ছেলে। তারা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। যে যেখানে পারে সুবিধামত নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। সেই যুবকরা আজ প্রায় সবাই বৃদ্ধের কোঠায়।
তেমনি একজন আব্দুর রহমান। তিনি অনেক দেশ ঘুরে মন্ট্রিয়েলে এসে পৌছেন ১৯৯৭ সালে। তখনও রাজনৈতিক আশ্রয় মিলত সহজে। রহমান সাহেবও আশ্রয় প্রার্থনা করে খুব অল্পদিনেই পেয়ে যান আশ্রয়ের ঠিকানা কানাডা। বিধি বাম। পরিক্ষায় ধরা পড়ল তাঁর দুটো কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ১৯৯৭ সালেই পেয়ে গেলেন এক অজানা ডোনারের কিডনী। স্থাপন করা হল। সুস্থ হয়ে কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। কাজকর্মের সুবিধা এবং বাংলা টাউনের টানে ২০০০ সালে চলে আসেন টরন্টোতে। কঠোর পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করে নিয়ে আসেন তার পরিবার। এক ছেলে আর এক মেয়ে এবং তার স্ত্রী ফয়জুননেছা বেবিকে নিয়ে তার সংসার। খুব সুখেই চলছিল তাদের সংসার। ২০০৩ সালে আবার নষ্ট হয়ে গেল স্থাপন করা কিডনী। এখন তাকে বেঁচে থাকতে হবে ডায়লুসিসএ উপর। প্রতি সপ্তাহে তিন দিন। ডায়লুসিস করে তিনি বেঁচে রইলেন আর দরখাস্ত করে রাখলেন নতুন কিডনীর জন্য। হাসপাতালে কিডনী ডোনারের চেয়ে রুগী বেশি হওয়ায় রহমান সাহেবকে থাকতে হল লাইনে। হাসপাতাল থেকে বলা হল আগামী দশ বছর অপেক্ষা করার জন্য। এতদিন তার শরীর ডায়লুসিস বহন করতে পারবে কিনা সন্দেহ। এর মাঝে পাঁচ বছর চলে গেছে ডায়লুসিসের উপর নির্ভর করে। আগামী দশ বছর কিছুতেই অপেক্ষা করা যায় না। কখন কি হয় বলা যায় না। তিনি তার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলেন। তার স্ত্রী নিজের কিডনী দিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তিনি চাইলেই দিতে পারেন না। প্রথম টেলিফোন ইন্টাভিউতেই তিনি ফেল করলেন। কারন তিনি নিজেই অসুস্থ। হতাশ হয়ে তারা দুজনে অন্য উপায় করা যায় কিনা ভাবছে।

তাদের একমাত্র ছেলে ওমর। সবেমাত্র আঠার পেরিয়ে উনিশে পা দিয়েছে। বিবিএ তৃতীয় বর্ষে পড়ছে। পাশের রুম থেকে সে তার বাবা মায়ের কথা শুনছিল। সে উঠে এসে টেলিফোনটা হাতে নিয়ে রিডায়াল করল। ডাক্তারের সাথে কথা বলল। সব শুনে ডাক্তার বলল তুমি আরও ভেবে দেখ। তারপর আমার সাথে দেখা কর।
তারা স্বামীস্ত্রী দুজনেই ওমরকে বুঝাতে চেষ্টা করল, তোমার এই বয়সে কিডনী দেবার প্রয়োজন নেই। তোমার জীবনটা একটা হুমকীর মুখে ঠেলে দেবার কোন মানে হয়না। রহমান সাহেব বললেন, আমি এখন পঞ্চাশের কোটায়। বাচঁব আর কদিন! আমার জন্য তুমি এতবড় ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। আমি যে কয়দিন বাচতে পারব তাতেই আমি খুশি। তুমি তোমার জীবন নষ্ট করবে কেন?

উত্তরে ওমর বলল, আমি ডাক্তারের সাথে সব ব্যাপারে আলাপ করেছি। একটা কিডনী না থাকলে মানুষের কোনই অসুবিধা হয় না। দুটা থাকলে যেই একটা থাকলেও তাই। আর জীবনের কোন ঝুকি নেই। যা আছে তা খুবই নগন্য। আমি খুবই সুস্থ আছি। একটা কিডনী না থাকলে আমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি ঠিক করেছি বাবাকে একটা কিডনী দিব। তাতে তোমারা যতকিছুই বুঝাতে চাও কাজ হবে না। আমি ডাক্তারকে বলেছি আগামী কাল হাসপাতালে যাব। আমার কি কি পরিক্ষা করবে। তারপর সব কাজ হয়ে যাবে। বাবা আবার নতুন জীবন ফিরে পাবে। আমরা বাবাকে পাব। বাবার চিন্তায় আমি নিজে অসুস্থ হয়ে যাব। তাই আমাকে সুস্থ রাখতে হলে বাবাকে একটা কিডনী দিতে হবে। তাহলেই আমরা দুশ্চিন্তায় থাকবনা, সবাই সুস্থ থাকব। হাসি আনন্দে থাকব। আমাকে বাধা দিওনা মা।

মাতাপিতার মন! আঠার বছরের ছেলে এই বয়সে তার একটা কিডনী দিয়ে দেবে! তাদের মন কিছুতেই সায় দেয় না। লেখাপড়ার পাশাপাশি ওমর একজন ভাল গোল কীপার। বাঙালি ফুটবল টীমে সে অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছে। সদা হাস্যমুখ ওমরের অনেক বন্ধুবান্ধব। রহমান সাহেব ওমরের কয়েকজন বন্ধুকে বললেন ওমরকে বুঝাতে যাতে কিডনী দেয়ার চিন্তাটা মাথা থেকে বাদ দেয়। ওমর কারও কথা শুনেনি। সে অটল।
রহমান সাহেব দেশে তার বড় ভাইকে সব জানালেন এবং বললেন ওমরকে বুঝাতে। ওমর তার চাচার কথা শুনে বলল, আপনি কি আপনার বাবাকে বাচাঁতেন না এমন পরিস্থিতি হলে? প্রশ্ন শুনে তার চাচা চুপ হয়ে গেলেন।
শেষ পর্যন্ত রহমান সাহেব রাজি হতে বাধ্য হলেন।
কিডনী দেয়া নেয়ার কাজ শুরু হল। দিন তারিখ ঠিক হল।

হাসপাতালে শুয়ে আছে পিতা পুত্র। আলাদা বিছানায়। নার্স তাদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে। পিতা ভাবছে যে সন্তানকে আমি জন্ম দিলাম সেই সন্তান আজ আমাকে নতুন জীবন দিতে যাচ্ছে! শরীরের একটা প্রধান অঙ্গা কেটে নিয়ে যাবে তার দেহ থেকে! সে স্বতস্ফূর্তভাবে দান করছে তার জন্মদাতাকে! এ কত বড় সাহসের প্রয়োজন! এমন সাহসি সন্তানের জন্ম দিতে পেরেছি! আমি গর্বিত পিতা। আমার জীবন স্বার্থক। তিনি হাত তোলে আল্লার কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, আমার ওমরের যেন কোন ক্ষতি না হয়। আমি না বাচলে ক্ষতি নেই। ওমর যেন দীর্ঘজিবী হয়!
পুত্র শুয়ে আছে তার বিছানায়। নার্স প্রস্তুত। যে কোন সময় তাকে অপারেশ থিয়েটারে নিয়ে যাবে। ওমর ভাবছে তার বাবার কথা। বাবা মৃত্যুপথযাত্রি। আমার একটা কিডনী দিলে তিনি নতুন জীবন ফিরে পাবেন। একটা কিডনী না থাকলে একজন মানুষ সুস্থভাবেই চলতে পারে। ডাক্তার বলেছে একটা কিডনী না থাকলে আমার কোনই ক্ষতি হবে না। জীবনের ঝুঁকি সহস্রে একটিও নেই। তবে কেন বাবাকে আমি নতুন জীবন দান করব না! আমি আমার কিডনী দিতে পারছি বলে আমি ভাগ্যবান, আমি গর্বিত। এই ভেবে সে বুক ফুলিয়ে প্রস্তুত হল।
অপারেশন থিয়েটার থেকে যখন বের হল চোখ খুলে দেখল তার মা প্যাশে দাড়িয়ে হাসছে। সব ঠিক আছে বাবা! কিডনী স্থাপন ঠিক ভাবেই হয়েছে। তোমার বাবাও ভাল আছে।
ওমর হেসে বলল, হয়ে গেছে? আমি তো টেরই পাইনি। এই সামান্য জিনিষের জন্য বাবা মরতে বসেছিল? আগে জানলে তো আমি আগেই দিতাম। তোমরা বলনি! এখন বাবা কোথায়? দেখতে পাব?
তোমার বাবা নীচের তলায় আছে। এখন নয়, তিন দিন পর দেখতে পাবে। কোন চিন্তার কারন নেই, সব ঠিক আছে। কিডনী ঠিকভাবে কাজ করছে। চারদিন পরই আমরা বাসায় চলে যাব।
পাঁচদিন পর পিতাপুত্র সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এল। পরিবারে আনন্দের জোয়ার বইছে। সবাই সুস্থ। ওমর আবার মাঠে। ফুটবল খেলায় ফিরে গেছে আরও মনের জোর নিয়ে।
রহমান সাহেব বললেন, এখন ওমর তো আমার বাবা, তাই আর নাম ধরে ডাকি না। বাবা বলেই ডাকি। কারন সে এখন আমার জন্মদাতা।

ওমর রহমান সাহেবকে কি বলে ডাকে জিজ্ঞেস করিনি।
এই হল রহমান সাহেবের নতুন জীবনের শানে নজুল।
আমাদের এই কমিউনিটির সকলের জানা উচিত, ডাক্তারি মতে, একজন মানুষের একটা কিডনী না থাকলে জীবনের কোন ঝুঁকি নেই। অনায়াসে একটা কিডনী দান করা যায়। আত্মীয়স্বজনের মাঝেই সবকিছু মেচ করে। তাই এ ধরনের পরিস্থিতির সৃস্টি হলে নিজেদের আত্মীয়স্বজনকেই এগিয়ে আসতে হবে। কিডনী কেনার সামর্থ আমাদের অনেকেরই নেই। তাই আমরাই আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে। একে অপরকে বাঁচাবে, নিজেরাও সুখে থাকবে।

-o-

বাংলা টাউনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, গ্রোসারি, বেকারি, মানি এক্সেজেঞ্জ, একাউন্টিং, ফার্নিচার, বিনোদন আর আছে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং বই'র দোকান। অন্যান্য ব্যবসার তুলনায় সেবামূলক ব্যবসার সংখ্যাই বেশি। কারন এতে মূলধন বলতে তেমন কিছু লাগে না। লাগে ব্যবসা সম্মন্ধে বিশদ জ্ঞান থাকা এবং তা পরিস্কার ভাষায় আগাগোড়া বুঝিয়ে ক্রেতাকে মুগ্ধ করা। শুধু বাংলা টাউনে নয়, এ ব্যবসা এখন পৃথিবী ব্যাপী। কানাডার সমস্ত ব্যবসার অর্ধেক হল সেবামূলক ব্যবসা। এই সেবামূলক ব্যবসা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। যেহেতু বাংলা টাউনের গোড়াপত্তন হয়েছে গ্রোসারী দিয়ে তাই আমরা এখন গ্রোসারী নিয়ে কিছু আলোচনা করব।
বাংলা টাউনে যত রকমের ব্যবসা আছে তার মাঝে (আমার মনে হয়) সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমের ব্যবসা হল গ্রোসারি। কত জায়গা থেকে কত রকমের জিনিষ আহরন করে আমাদের রসনা তৃপ্ত করার মানসে এই গ্রোসারীগুলো কাজ করে

যাচ্ছে তা আমরা জানতে চাইনা বা প্রয়োজন মনে করি না। আমরা চাই যে জিনিষটা প্রয়োজন তা আছে কিনা, দাম কত এবং ফ্র্যাস কিনা। যেহেতু কয়েকটা গ্রোসারি খুব কাছাকাছি তাই দাম যাচাই করার সুযোগ আছে। বাংলা টাউনে প্রধান আকর্ষন হল বাংলাদেশের মাছ তরিতরকারি যা এ দেশে উৎপাদন হয়না। এক দশক আগে এসব জিনিষ ছিল কল্পনা। এখন শুধু বাস্তবেই নয় একশবার যাচাই বাছাই করে তবে কিনতে পাই। বাংলাদেশের জিনিষের দাম এখানকার গ্রোসারি মালিকের অনেকটা হাত নেই। ধরা যাক ইলিশ মাছের কথা। হঠাৎ করে দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে বলে আমরা দোকানদারকেই দায়ী করি। খোজ নিয়ে জানা গেছে যারা সাপ্লাইয়ার তারা কিছুটা দায়ী আর কিছুটা দায়ী বাংলাদেশে উৎপাদন যারা করে তারা। অবশ্য ইলিশ বেশিরভাগ উৎপাদিত হয় মায়ানমার বা বার্মাতে। সেখান থেকে আকাশপতে পাঠাতে আগে যা ভাড়া লাগত তা এখন দ্বিগুনের কাছাকাছি দিতে হয়। বাংলাদেশের অবস্থাও তাই। লেবার কষ্ট বেড়েছে পৃথিবীব্যাপী। আমরা যখন ইলিশটা এখান থেকে কিনতে যাই তখন এই সব খরচ ইলিশের লেজের সাথে যোগ করতে বাধ্য হয় দোকানদার। তার সাথে যোগ করতে হয় পচেঁ যাওয়া জিনিষের দাম, নষ্ট জিনিষ এবং সর্বোপরি তাদের বেচেঁ থাকার ন্যূনতম মুনাফা যা না করলে তাদের ব্যবসা লাল বাতি জ্বলবে। এতসব ঝামেলা পোহানের পর গ্রোসারি ব্যবসায় লাভ হয় কত? কয়েকজন গ্রোসারী ব্যবসায়ীর সাথে আলাপ করে জানা গেছে ৫ থেকে ১০ পার্সেন্ট লাভ করেন। যা খুবই নগন্য এবং তা দিয়ে কোন রকমে টিকে থাকা যায়।
শুধু ইলিশই নয়, বাংলাদেশের সব জিনিষের উপর এই সব ধরনের খরচ যোগ করতে হবে তবেই আমরা এই দুর প্রবাসে বসে নিজের দেশের স্বাদ খুব আয়েসে ভোগ করব।

বাংলা টাউনে ব্যবসা করে কেউ বিরাট কিছু করতে পেরেছে বলে জানা নেই। কিছু কিছু ব্যবসা কঠোর পরিশ্রমের। সে অনুপাতে লাভ বলতে কিছুই থাকে না। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। সর্বনিম্ন মুনাফা করেও অনেক সময় টিকে থাকা যায় না। সৎপথে ব্যবসা করে কেউ খুব একটা উন্নতি করতে পারেনি। অসৎ ব্যবসায়ীদের কথা বাদ দিলে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী ঋনের বোঝা মাথায় নিয়ে ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছে। যারা লাভ লোকসানের খাতা মিলাতে পারেনি তারা সব ছেড়ে চলে গেছে। এমনি অনেক ব্যবসা হারিয়ে গেছে। এর প্রধান কারন যার যে ব্যবসায় অভিজ্ঞতা নেই, সেই ব্যবসা করতে গেলেই লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে ব্যবসা ছেড়ে দিতে হয়। ব্যবসায়ী কেটাগরিতে যারা নতুন ইমিগ্রেশন নিয়ে আসেন তাদের বাধ্যতামুলক ব্যবসা শুরু করতে হয়। তারা তখন লাভ লোকসানের চিন্তা করেন না। শুরু করতে হবে একটা কিছু। সামনে যা পায় তাই নিয়ে শুরু করেন। অনেকেই শুরু করার আগে মনে করেন এটা এমন আর কি! শুরু করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কোনটাই সোজা নয়। কোন ব্যবসাই কঠোর পরিশ্রম না করে টিকিয়ে রাখা যায় না। তাই দেখা যায় একটা ব্যবসা কয়েকবার হাতবদল হয়। কেউ কেউ এমন গচ্ছা দিয়ে সরে পড়েছেন যা কখনও পুরন করা যাবেনা।

একটা ব্যবসার দেখাদেখি এ জাতীয় আরও ব্যবসা শুরু হওয়া মানে প্রতিযোগির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। প্রতিযোগিতা বেশি হওয়া মানে ক্রেতার পোয়া বার। ক্রেতারা হন বেশি লাভবান। আমরা চাই প্রতিযোগির সংখ্যা আরও বেশি হোক আমরা আরও প্রতিযোগিতামুলক মুল্যে প্রয়োজনীয় পন্য ক্রয় করি। এই প্রতিযোগিতা মানে এ নয় যে ব্যবসা লাটে তুলে প্রতিযোগিতায় জিততে হবে। ব্যবসা ঠিক রেখেই প্রতিযোগিতা করতে হবে এবং টিকে থাকতে হবে। নিজের ক্ষতি করে প্রতিযোগতায় যারা লাগাম ছাড়া দৌড়ে নেমে পড়ে তারাই পরবর্তিতে হারিয়ে যায়।

কয়েকজন গ্রোসারির মালিক আক্ষেপ করে বললেন, আমাদের দাম কম বা সমান থাকলেও অনেকেই চলে যান চায়নিজ দোকানে। একই দামে অন্য দেশী, অন্য জাতীর দোকান থেকে জিনিষ কেনা মানে আমাদের উপেক্ষা করা। বাঙালি আমাদের সহযোগিতা না করলে আমরা কিভাবে টিকে থাকব! অথচ কোন চায়নিজ আমাদের দোকানে কোন কিছু কেনা কাটা করতে আসে না। পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির মাঝে একটা মনের টান থাকে, সহযোগিতার মনোভাব থাকে। তাই এরা সব ব্যবসাতেই এগিয়ে আছে। আমরা আশা করব বাংলাদেশি গ্রাহকরা আমাদের সহযোগিতা করবেন। তা না হলে আমাদের টিকে থাকা দায় হবে।

এই ব্যবসায়ীরা আরও একটি বিষয়ের উপর তাদের দুশ্চিন্তার কথা বললেন যা আমরা এই পরবাসে উন্নত দেশে উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে তা চিন্তাও করতে পারি না। তা হলো সপ লিফটিং মানে চুরি। দিন দিন তার ব্যাপকতা বাড়ছে। এমন সব কিছু মানুষ হাতে নাতে ধরা পড়েছে যা শুনলে আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। এবং এসব হয়েছে বাংলা টাউনের গ্রোসারীগুলোতে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রবাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করা প্রয়োজন।

মাঝে মাঝে দেখা যায় কোন কোন ব্যবসা বেশ উন্নতির দিকে যাচ্ছে। যখনই উন্নতির দিকে যাচ্ছে তখনই দেখা দেয় অহংকার। অহংকার পতনের মুল। মালিক তখন অতি পরিচিত মানুষকেও না দেখার ভান অথবা উপেক্ষা করেন। তাতে ব্যবসার অপুরনীয় ক্ষতি হয়। মানুষের ব্যবহার দিয়ে মানুষকে কাছে টানা যায়। ব্যবসায়ী যদি ব্যবসায়ীক আচরন না

করে যাকে বলে কাষ্টমার সার্ভিস, তাহলে ব্যবসার উন্নতি আশা করা যায় না। কাষ্টমার সার্ভিস যার যত ভাল সে তত উন্নতি করতে পারে। আমাদের এ বিষয়টার খুব অভাব।

এই কাষ্টমার সার্ভিসেরও একটা কায়দা আছে। কোন কোন সময় অদ্ভুদ কাষ্টমার আসে অদ্ভুদ দাবী নিয়ে। যেসব সার্ভিস অন্য কোথায়ও চিন্তা করা যায় না। শুধু বাংলা টাউনেই এই সার্ভিস পাওয়া যায়। সুলভে। ফ্রি। যেমন এক বস্তা চাউল কিনে বললেন, গাড়ীতে তোলে দিন। কাষ্টমারকে ধরে রাখতে হলে মালিককে এই অদ্ভুদ আবদার রক্ষা করতে হয়। কে দেবে এই চাউলের বস্তা গাড়িতে তোলে? আমাদের মজ্জাগত অভ্যেস ব্যবসার মালিক এসব কাজ করবেন না। তাহলে? হয়ত যিনি মাংস কাটেন বা অন্যান্য কাজে সাহায্য করেন তাকেই তোলে দিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় বাবার বয়সি কোন একজন শুধু চাউলের বস্তাই নয়, সমস্ত বাজার সদাই গাড়ীতে তোলে দিচ্ছে। অথচ খোজ নিলে জানা যাবে যিনি এই কাজটা করলেন তিনি এখানে এসে বিপাকে পড়েই এই ছোট কাজগুলো করছেন। দেশে ছিলেন তিনি একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। এই পরবাসে সুখ নামক বস্তুটাকে ধরতে এসে তিনি বাধ্য হচ্ছেন এই কাজ করতে। দেশে থাকলে এই কাষ্টমার হয়ত তার সামনে দাড়ানোর সাহস পেতনা। এই সার্ভিসখানা একমাত্র বাংলা টাউনেই পাওয়া যায়। তারপরও অনেক সময় কাষ্টমারের মন রক্ষা করা যায় না। অনেক সময় কাষ্টমার হেলথ ডিপার্টমেন্টে কল করে ব্যবসায়ীকে টানা হেচড়া করায়। এমনি একটি ঘটনার কথা বললেন একজন গ্রোসারির মালিক। যদিও তিনি আর এ ব্যবসায় নেই। তিনি বললেন, একজন কাষ্টমার সকাল এগারটায় দোকানে এসে চিকেন লেগ নিলেন দশ পাউন্ড এবং আরও অন্যান্য জিনিষ। পনের দিন পর তিনি ফোন করলেন।

কাষ্টমার: হেলো, আপনাদের মুরগী পচা পড়েছে। এসব পচা জিনিষ রাখেন কেন?

মালিক: জ্বি ভাইজান, আপনি কবে নিয়েছিলেন মুরগী?

কাষ্টমার: মুরগী না, মুরগীর লেগ নিয়েছিলাম দু' সপ্তাহ আগে। এখন দেখি পচা গন্ধ বেরোচ্ছে।

মালিক: আমাদের এখানে তো দুদিনের বেশি পুরনো জিনিষ থাকে না, তাছাড়া আমাদের ফ্রিজার তো হেলথ ডিপার্টমেন্টের নির্দিষ্ট মিটার অনুযায়ীই চলছে। নষ্ট হবার কোন উপায় নেই।

কাষ্টমার: তাহলে কি আমি মিথ্যা বলছি?

মালিক: আচ্ছা ভাইজান, নিয়ে আসুন। বদলে দিব।

কাষ্টমার: কাল আমার স্ত্রী নিয়ে আসবে। আমার কাজ আছে। ফ্রেস জিনিষ দিবেন। আবার যেন পচা না পড়ে।

মালিক: ঠিক আছে, নিয়ে আসতে বলুন।

পরের দিন তার স্ত্রী যখন নিয়ে আসল তখন মালিক নামাজ পড়তে গেছেন। স্ত্রী এসে ক্যাসিয়ারের কাছে দিয়ে বললেন বদল করে দিতে। ক্যাশিয়ার কিছুই জানে না এবং বলল একটু অপেক্ষা করতে, এখনি চলে আসবেন মালিক। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করতে রাজি নন। তিনি ফোন করলেন তার স্বামীর কাছে। একটু পরই মালিক ফিরে এল নামাজ পড়ে। তিনি ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন নষ্ট হল কিভাবে বুঝতে পারলাম না। কথা বলে জানা গেল সেই সকালে মুরগী নিয়ে গাড়ীতে রেখে সারাদিন কাজ করে রাতে ঘরে ফিরে ফ্রিজে রেখেছে। তারপর গতকাল বের করে দেখেছে পচা। এই পচা তো কাষ্টমার করেছেন। গ্রোসারি মালিক ফেরত দেবে কেন। এর মাঝেই কাষ্টমার ফোন করল।

কাষ্টমার: কি হল সাহেব, ফেরত দিবেন বলে নাকি দোকানেই নেই? আমার স্ত্রী অনেকক্ষন অপেক্ষা করছে।

মালিক: আরে ভাই, জিনিষ তো আপনার দোষে পচেছে। আমরা এটা ফেরত দেব কেন?

কাষ্টমার: দিবেন না? জানেন আমি কে?

মালিক: আপনি কে আমার জানার খুব দরকার আছে বলে মনে করি না। দশ পাউন্ড লেগ ফেরত দিলে আমার এমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু আপনার কথাবার্তায় আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ফেরত দেবনা।

কাষ্টমার: তাহলে দেখেন মজা।

পরের দিন হেলথ ডিপার্টমেন্টের লোক এসে সব পরিক্ষা করে দেখল। সব ঠিক আছে। তার অভিযোগ মিথ্যা প্রমানিত হল।

এই হল আমাদের ব্যবসায়ীদের প্রতি কাষ্টমারের ব্যবহার।

এত সব সার্ভিস দেবার পরও যদি ব্যবসায় টিকে থাকা না যায় তাহলে বুঝতে হবে আমাদের অংকে কোথায়ও গড়মিল আছে। মানে সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড। কোন্‌টা বেশি, অথবা ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা বেশি কিনা। অংক মিলাতে না পারলেই ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলে।

-০-

কোন কেনাকাটা না থাকলেও বাংলা টাউনে একবার একটা চক্কর দেই। মাঝে মাঝে গ্রোসারীতে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের তরিতরকারি দেখি। নতুন কোন জিনিষ এল কিনা, দাম কেমন ইত্যাদি। সেদিন বাংলা টাউনে এমনি উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে ঘুরে এক সময় ঘরোয়া রেষ্টুরেন্টে বসে এক কাপ চা নিয়ে আয়েসে চুমুক দিচ্ছি। এমন সময় এসে গেল নাফিস। আসল নাম বলতে মানা তাই এই নামটাই দিলাম। আমার দেখাদেখি তিনিও এক কাপ চা নিয়ে সামনে এসে বসলেন। চা শেষ করার আগেই বৃষ্টি নামল। কোথায় যেন যেতে হবে তাকে। বললেন এখন যাই কি করে! একটা ছাতার খুব প্রয়োজন।

আমি আবার ছাতা হাতে নিয়ে চলতে পারি না। কারন হারিয়ে ফেলি। এমনি এক বৃষ্টির দিনে একদিন আলম ভাই আমাকে একটা ছাতা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। সে ছাতা একটা কাহিনী হয়ে গেল। শুনবে কাহিনীটা?
বললাম, বলুন শুনি।
তিনি কাহিনীটা বললেন। নাফিসের মুখের কথাগুলো আমি ছাতার হয়ে শুধু বলে যাচ্ছি। তার সত্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব না। যার যার দায়ীত্বে এ গল্প পড়বেন। ছাতার মুখ দিয়েই গল্পটা শোন যাক।

একটি ছাতার আত্মকাহিনী

আমি একটি ছাতা। বাংলা টাউনের ঘরোয়া রেষ্টুরেন্টের এক কোনে পড়েছিলাম অনেক দিন। কারন প্রয়োজন না হলে কেউ আমার খোজ করেনা। বাদল দিনে অথবা খা খা রোদে আমার মত উপকারি বন্ধু মানুষের আর হয়না। আজকে আমার আদর অনাদর সবকিছুরই একটা ইতিহাস আছে। আমার নিজের একটা আদি কথা আছে।
এক সময় জুতা আর ছাতা ছিল মানুষের আভিজাত্যের প্রতীক। সাধারন মানুষ জুতা আর ছাতা ব্যবহার করতে পারত না। শুধু শাসক এবং আভিজাত্য শ্রেনী ব্যবহার করত। জুতা আবিস্কারের গল্প অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু ছাতা আবিস্কারের কথা আমারই মনে নেই আর মানুষ মনে রাখবে কি করে! আমার নিজের গল্প শুরু করার আগে আমার আদি পর্বের কিছু বিবরন পেশ করব।
ছাতা আবিস্কৃত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে। কে বা কারা কোথায় আবিস্কার করেছিল তা মনে না থাকায় এখন মানুষ ছাতা আবিস্কার নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে গেছে। কেউ বলে মিশরীয়রা, কেউ বলে চাইনিজরা। তবে প্রাচীন মিশর, গ্রীস ও চিন দেশের চিত্রকর্মে ছাতার নিদর্শন মিলে।
যাই হোক ছাতা আবিস্কারের কাহিনী অনেক পুরনো হলেও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছাতার ব্যবহার ছিল খুব কম। কারন তখন ছাতার আকৃতি ছিল অনেক বড় এবং ওজন ছিল বেশি। ছাতার বাহুগুলো মানে পাঁজরগুলো ছিল কাঠের বা তিমি মাছের কাঁটার এবং হাতল ছিল দেড় মিটার। তাই গড় ওজন ছিল প্রায় চার পাঁচ কেজি।
ছাতা নামটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'টগইজা' থেকে যার অর্থ হল শেডু বা শেড। ষোরশ শতাবদীর প্রথম দিকে ছাতার কদর বাড়তে থাকে উত্তর ইউরোপের বৃষ্টিপ্রধান দেশগুলোতে। বিশেষ করে লন্ডনে। এ সময় নারীরাই ছাতা বেশি ব্যবহার করত। পারস্য পর্যটক এবং লেখক জোনাস হ্যানওয়ে ছাতাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। ইংলন্ডের রাস্তায় একটানা তিরিশ বছর তিনি ছাতা তার সঙ্গী করেন। তিনি ছাতাকে পুরুষদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। তাই ইংরেজদের মধ্যে ছাতার অপর নাম হ্যানওয়ে। তাঁর প্রচেষ্টাতেই নারী পুরুষ সবাই ছাতাকে সঙ্গী করে নিল।

বিশ্বের প্রথম ছাতার দোকান জেমস স্মিত এন্ড সন্স চালু হয় ১৮৩০ সালে এবং এই দোকান লন্ডনের ৫৩ নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রিটে আজও চালু আছে। ১৮৫২ সালে স্যামুয়েল ফক্স স্টিলের চিকন রড দিয়ে রানী ভিক্টোরিয়ার জন্য ছাতা তৈরি করেন। তখন ছাতার খুব চাহিদা থাকায় লন্ডনে অনেক রকমের ডিজাইন, যেমন হাতির দাঁত, সোনা, রুপা, চামড়া, বিভিন্ন প্রানীর শিং ইত্যাদি দিয়ে ছাতা তৈরি করত। ১৭১৫ সালে পারস্যের এক নাগরিক পকেট ছাতা আবিস্কার করেন। ১৮৫২ সালে গেড নামে একজন প্যারিস নাগরিক স্বয়ংক্রিয় সুইসের সাহায্যে ছাতা খোলার পদ্ধতি আবিস্কার করেন। ১৯২০ সালে জার্মানির হ্যানস হাপট সহজে পকেটে বহনযোগ্য ছাতা তৈরি করেন। ১৯৬০ সালে পলিয়েস্টার কাপড়ের ছাতা পৃথিবীজুড়ে ব্যাপক হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। এক সময় ছাতার রং কালো থাকলেও এখন বাহারি রংয়ে ডঙ্গে তৈরি হচ্ছে। এখন অনেক আকর্ষনীয় রুপে অনেক ডিজাইনের ছাতা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার রঙটি খুব আকর্ষনীয় নয়। সাদা মাটা। একটু মেটে।

আমার জন্ম হয়েছিল তাইওয়ানের একটি কারখানায়। ঠুনকো সস্তা জিনিষ দিয়ে আমার দেহ তৈরি হয়েছিল। সেখান থেকে কানাডা আসার কাহিনী বলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। এদেশে আসার পর আমার স্থান হল একটি ভ্যারাইটি স্টোরে। এক বাদল দিনে একজন বঙ্গসন্তান তাড়াহুড়ো করে কিনে নিল আমাকে। সেই থেকে শুরু হল আমার কর্মজীবন। আমি মানুষের সেবা করি। রোদ বৃষ্টিতে মানুষকে ছায়া দান করি। কিন্তু ঝড়ে আমি কাবু হয়ে যাই। কারন আমার শারীরিক গঠন তেমন মজবুত নয়। কখনও আমার পাজর ভেঙ্গে যায়, উল্টে গিয়ে বেহুশ হয়ে যাই। তাই আমাকে সাবধানে ব্যবহার করতে হয় তা সবাই জানে।

আমার মুল্য খুব বেশি না হওয়ায় আমার কদর খুব একটা নেই। মানুষ বেশি দামী জিনিষকে বেশি কদর করে। হোক তার প্রয়োজন বেশি বা কম, বেশি টাকাটাই তাদের কাছে বড়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় আমাকে না হলে তাদের চলে না। তখন আমার কদর এত বেড়ে যায় যে আমাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তখন আমি বেশি দামী জিনিষের চেয়ে অনেক বেশি সেবা দিয়ে থাকি। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আমার আর কোন খবর থাকেনা। যেখানে সেখানে ফেলে রাখে।

যিনি আমাকে কিনে নিলেন তার হয়ত তাড়াতাড়ি যাবার কথা কোথাও। অপেক্ষা করার সময় নেই। তিনি ভ্যারাইটি ষ্টোরে ঢুকে দাম জিজ্ঞেস না করেই হাতে নিয়ে নিলেন। কারন এখন আমার প্রয়োজন এত বেশি যে দাম জানার প্রয়োজন নেই। তবে তার ধরনা আছে আমার দাম খুব বেশি হবে না। দু ডলার কত সেন্টস দিয়ে কিনে তিনি আমাকে মাথায় দিয়ে রওয়ানা দিলেন বাংলা টাউনের দিকে। বেশ জোরে বাতাস বইছে। বৃষ্টি তেছড়া হয়ে তার পায়ের অংশ ভিজে যাচ্ছে। সে চেষ্টা করছে শরীরের নীচের অংশটাকে বৃষ্টি থেকে বাচাতে। পারছে না। একসময় জোড়ে হাওয়া এসে আমাকে উল্টে দিল। আমি একবারে বেহুশ হয়ে গেলাম। আমাকে টেনে সোজা করতে করতে তার সমস্ত শরীর আধা ভিজা হয়ে গেল। সোজা করে মাথায় দিতে গিয়ে দেখল আমার একটা পাজর ভেঙ্গে গেছে। আগেই বলেছি আমার শারীরিক গঠন একবারে ঠুনকো। একটু ধাক্কাতেই আমি কাবু হয়ে যাই। ভেঙ্গে নেতিয়ে পড়ি। একটা ভাংগা পাজর নিয়েই আমার মালিকের মাথাটুকু বাচানোর মত শক্তি নিয়ে আমি সেবা করার জন্য প্রস্তুত রইলাম। তিনি আমাকে খুব সাবধানে, অতি যতনে মাথায় দিয়ে, কোন রকমে মাথা বাঁচিয়ে হন হন করে চললেন। বাংলা টাউনে ঘরোয়া নামে একটা রেষ্টুরেন্টে ঢুকলেন। সেখানে আরও কয়েকজন বঙ্গসন্তান ছিল। তারা তাকে দেখে বলল, এইযে, কদম আলী এসে গেছে।

কদম আলী আমাকে রেষ্টুরেন্টের এক কোনে রেখে গল্প খাওয়া দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অনেক ক্ষন চল তাদের গল্প। এক সময় তিনি আমাকে রেখে চলে গেলেন। কারন এখন আর বৃষ্টি নেই। আমর প্রয়োজন নেই। তিনি কি আমার কথা ভুলে গেলেন না কি আমার শারীরিক অবস্থার জন্য ইচ্ছে করে ফেলে গেলেন বুঝা গেল না। হয়ত ভেবেছেন এই ভাঙ্গা পাজর নিয়ে আমি আর কোন কাজেই লাগব না। যদি আমার মুল্য দু ডলার না হয়ে পাঁচ শ ডলার হত তাহলে কদম আলী হয়ত এমনি অবহেলা করত না। আদর করে তার বগলে করে নিয়ে যেত। চেষ্টা করত আমার পাজর সারিয়ে তোলার। না হয় ভাঙ্গা পাজর নিয়েই কাজ চালিয়ে নিত। আমি সস্তা বলেই এমনিভাবে ফেলে রেখে চলে গেল।

এখন আমার কোন মালিক নেই। এক কোনে পড়ে আছি। কত মানুষ আসে যায়। কেউ তাকায় কেউ তাকায় না। রাত এগারটার সময় রেস্টরেন্ট বন্ধ করে পরিস্কার করতে গিয়ে একজন কর্মচারি আমার খোজ পায়। সে আমাকে মেলে ধরে আমার নড়বড়ে দেহটা পরিক্ষা করল। দেখল একটা পাজর ভাঙ্গা। পাজর ভাঙ্গা ছাতায় তার প্রয়োজন নেই। রেষ্টুরেন্টের পেছনে ছোট একটা কামড়া, সেখানে রেষ্টুরেন্টের মালিক সৈয়দ শামসুল আলম (আলম ভাই নামেই পরিচিত) কিছু ভিডিও রাখেন, অন্য কাজকর্ম করেন। কর্মচারি আমাকে সেখানে নিয়ে গেল এবং বলল, আলম ভাই এই ছাতাটা পড়ে ছিল। বলে এক পাশে রেখে দিল। আলম ভাই আমাকে হাতে নিলেন। তিনি দরদ দিয়ে আমাকে নিরিক্ষা করলেন। বললেন একবারে অকেজো নয়। কাজ চালানো যেতে পারে। বলে তিনি আমাকে একটা রেকের পেছনে রেখে দিলেন। এখানে কেউ আমার খবর নিতে আসে না। কেউ ব্যবহারও করে না। অলসভাবে দিন কাটে ঘুমিয়ে।
আলম ভাই সদালাপি মানুষ। সেদিন তাঁর এক বন্ধু এল অফিসে। অনেকক্ষন কি সব নিয়ে কথাবার্তা চলল। কথাবার্তায় বুঝা গেল বন্ধুটির নাম নাফিস। একসময় নাফিস বলল, আমার এখনি যেতে হবে, বলে বেরিয়ে গেল।
কয়েক মুহুর্তেই ফিরে এল। বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নাফিস ফিরে এসে বলল, আরে আমি আবার বৃষ্টিতে ভিজতে পারিনা। তাহলে নির্ঘাত ঠান্ডা লেগে যাবে। আর ঠান্ডা লাগলে এন্টিবাওটিক ছাড়া সারবে না। ডায়াবেটিস রুগীর অনেক সমস্যা।
আলম ভাই জানে বন্ধুটি থাকে বাংলা টাউনের পেছনে ডেনটনিয়া পার্কের পরই একটা আকাশছোয়া অট্টালিকায়। এখান থেকে দশ মিনিটের পথ। বৃষ্টি যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে পুরোপুরি ভিজে যাবে।
আর তখনই মনে পড়ল আমার কথা। আলম ভাই রেকের পেছন থেকে তোলে এনে ধুলোবালি ঝেড়ে নাফিসের হাতে দিয়ে বললেন, এই ছাতাটার স্বাস্থ্য খুব ভাল নয়। তবে তোমার কাজ চলে যাবে। এটা নিয়ে চলে যাও।
নাফিস বাইরে গিয়ে আমাকে আকাশের নিচে মেলে ধরল। দেখল আমি একদিকে কাত হয়ে নেতিয়ে থাকি। তিনি খুব সাবধানে আমাকে ধরে বৃষ্টির ছাট থেকে নিজকে রক্ষা করে ডেন্টনিয়া পার্কের দিকে রওয়ানা দিলেন। পাঁজর ভাংগা হলে কি হবে, সেবাদান কিন্তু কম দিচ্ছি না। এখন আমার অনেক কদর।
ডেন্টনিয়া পার্কের কাছে যেতেই বৃষ্টির বেগ আরও বেড়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। তবে হাওয়া না থাকায় আমার শরীরে এমন কোন চাপ পড়েনি। নাফিসকে বৃষ্টি থেকে পুরোপুরি রক্ষা করছি। চারদিক নির্জন। কোন মানুষজন নেই। মাঠের কোনে বড় গাছটির কাছে পৌছতেই নাফিসের নজর গেল গাছের নীচে কে একজন বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার আপ্রান চেষ্টা করছে। আরও কাছে গিয়ে নাফিস থমকে দাড়িয়ে গেল। মনে হল নাফিসের দেহটা পুলকে নেচে উঠল। মানুষের বিপদ দেখলে মানুষের দু:খিত হবার কথা। তা না করে নাফিস এত আনন্দিত! খুব তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলল, আরে মিতা! তুমি যে ভিজে যাচ্ছ! এস, ছাতার নীচে এস!

মিতা আমার আশ্রয়ে এসে দাড়াল। পাখী যেমন তার বাচ্চাকে ডানা দিয়ে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে আমিও ঠিক তেমনি আমার ভাঙ্গা পাঁজর নিয়ে দুজন মানুষকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি। আর নাফিস চেষ্টা করছে মিতাকে আগলে রাখতে।

আমার ডানার নীচে দাঁড়িয়ে কে যে বেশি খুশি হল তা আমি বুঝতে পারিনি। তবে মনে হল মিতার দেহটা মৃদু কাঁপছে। ভয়ে না বৃষ্টি ভিজে ঠান্ডায় নাকি অন্য কোন কারনে তা বলা মুস্কিল। কারন তখন আগষ্ট মাস। দুজনের চোখে মুখে সমস্ত দেহে গোপন হাসির আভাস।

আমার ছায়ায় এসেই মিতা বলল, দেখুন তো ঘর থেকে বের হবার সময় কোন বৃষ্টি ছিল না। আর ভাবলাম এতটুকু পথ যেতে আর কতক্ষন লাগবে। হঠাৎ করে এমন বর্ষন শুরু হল গাছের নীচে আশ্রয় নেয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। এদেশে তো আর আমাদের মত নয় যে কোন বাড়ীর বারন্দায় বা দরজায় দাড়ানো যাবে এবং বৃষ্টি কমলে চলে যাব। আপনাকে না পেলে ভিজতে ভিজতেই কাজে যেতে হত।

তুমি কাজে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

মিতা কোথায় কাজ করে তা নাফিস জানে। বাংলা টাউনে একটা বাঙালি মালিকাধিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। মাঝে মাঝে দেখা হয়, কথা হয় দুর থেকে। এত কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়নি কোনদিন।

এই অঝোর বৃষ্টিতে যাবে কি করে। সহসা থামবে বলে তো মনে হয় না।

না থামুক, কিছু হবেনা। একদিন না হয় দেরীই হল, মিতা বলল।

নাফিস বলল, দেখ, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিনটিও কিন্তু ঠিক এমনি ছিল তা তোমার মনে আছে? রাত বারটায় সাবওয়ে থেকে বেরিয়ে দেখি আমার সামনে এক সুন্দরী রমনী। একা। দেখলেই বুঝা যায় বাঙালি। এই সাবওয়েতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। তুমিও রওয়ানা দিলে একই দিকে। ভাবলাম দুর থেকে পেছন পেছন যাব। এই বঙ্গ ললনাকে একা যেতে দেয়া ঠিক হবেনা। তুমি একটু এগিয়েই থেমে গেলে। তুমিও বোধ হয় একা যেতে সাহস পাচ্ছিলে না। আমি এগিয়ে যেতেই তুমি -

আমি সোজা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো বাঙালি। কোন্ দিকে যাবেন - মিতা যোগ করল।

আমি বললাম ক্রিসেন্ট টাউনে। নাফিস বলল।

আর আমি বললাম, তাহলে তো ভালই হল, এক সাথে যাওয়া যাবে। মিতা হাসিমুখে যোগ করল।

আর তখনি নামল ঝরঝরে বৃষ্টি। আমার কাছে ছাতা ছিল, বললাম ছাতার আশ্রয়ে আসার জন্য।

আমি বললাম, না, লাগবে না। ধন্যবাদ। মিতা বলল।

আজ কিন্তু না বলনি। যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলে।

সেদিনও আসতাম। প্রথম দেখাতেই এক ছাতার নীচে যেতে লজ্জা লাগছিল। যদিও আমি বুঝতে পারছিলাম আপনি খুব ভাল মানুষ।

কি করে বুঝেছিলে

আমি মানুষের চোখ দেখলেই বুঝতে পারি।

আমার চোখ বুঝি তাই বলছিল

হ্যা, এবং পরে আপনার সাথে যতবার দেখা হয়েছে ততবারই ইচ্ছে হয়েছে এই ভাল মানুষটাকে একবার ছুয়ে দিলে কেমন হয়! আজ এই বৃষ্টি সেই সুযোগ এনে দিয়েছে বলে মিতা তার এক হাত দিয়ে নাফিসকে জড়িয়ে ধরল।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। কারও মুখে কথা নেই। আমার এই ভাঙ্গা পাজর নিয়ে দুজন মানুষকে বৃষ্টি থেকে সম্পুর্ন রক্ষা করতে পারছি না। দুজনেরই অর্ধেক শরীর ভিজে যাচ্ছে। সেদিকে তাদের খেয়াল নেই। একজন আর একজনের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। এক সময় নাফিস একটা হাত মিতার কাধে রেখে বলল, কাজে যেতে হবে না?

যাব কি করে?

ছাতাটা নিয়ে যাও।

আপনি কিভাবে যাবেন?

আমি তো বাসার কাছেই এসে গেছি। এক দৌড়ে চলে যাব। তোমাকে তো বেশ দুর যেতে হবে। বৃষ্টি কমলেও একবারে শেষ হবে বলে মনে হয় না।

ঠিক আছে, আমি ছাতা নিয়েই চলে যাই, আর আপনি ভিজতে ভিজতে যান। বৃষ্টিতে ভিজতে খুব মজা। কাজ না থাকলে আমিও আপনার সাথে ভিজতাম।

চললাম, আবার দেখা হবে বলে নাফিস তাড়াতাড়ি ছুটে চলল মহা অট্টালিকার দিকে।

মিতা কয়েক মুহুর্ত তাকিয়ে রইল নাফিসের চলে যাবার দিকে। তারপর বেজার মুখে রওয়ানা দিল তার গন্তব্যে। এখন আমার মালিক মিতা।

মিতা আমাকে তার বাসায় নিয়ে এল। খুব যতনে আমার এই ভাঙ্গা দেহটাকে সে তোলে রাখল তার ওয়াড্রবের তাকের উপর। মিতার অন্যান্য পছন্দের সামগ্রীর সাথে। সেই থেকে মিতা আমাকে আর ব্যবহার করে না। যেখানে রেখেছে সেখাইে আছি। মাঝে মাঝে মিতা আমাকে আদর করে ধুলোবালি মুছে সেখানেই রেখে দেয়। আমি মানুষের সেবাদানে অযোগ্য হলে আমাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। মিতা আমাকে ছুড়ে ফেলল না, আবার ব্যবহারও করেনা। রেখেছে খুব যতনে। কি আছে মিতার মনে কে জানে! নারী মন! দেবতাও হার মানে!

-০-

গ্রোসারি দিয়েই শুরু হয়েছিল বাংলা টাউন। তাই গ্রোসারি নিয়ে এত কথা। তাছাড়া বাংলা গ্রোসারির প্রতি আমার নিজেরও কিছু দুর্বলতা রয়েছে। না, ঠিক গ্রোসারির প্রতি নয়, গ্রোসারির কিছু জিনিষের প্রতি। এই যেমন কাঁঠালের সিজনে যখন কাঁঠাল আসে তখন মনে হয় আমি প্রবাসে নই। গ্রামের বাড়ীতে আছি। দাম যাই হোক আমার কাঁঠাল খেতে হবে। ঘরে নিলে শান্তি পাওয়া যায়না। ছেলেমেয়েরা নাকে আঙ্গুল দিয়ে বলে, এটা কি খাও? আরও আছে কিছু জিনিষ যা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের গ্রোসারিতে মিলে না। দাম যাই হোক এখানে হাতের কাছে পাওয়া যায় এটাই বড় কথা। দেশি তরিতরকারি খেতে কার না সাধ জাগে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এসবের কাছেও যায় না। তাই এসব জিনিষের পুরো স্বাধ গ্রহন করা হয় না। যাঁরা গ্রোসারি ব্যবসা শুরু করেছিলেন তারাও বোধ হয় আমার মত কোন কোন জিনিষের প্রতি দুর্বল। তাই অন্য কোন ব্যবসা না দিয়ে বাংলা গ্রোসারি শুরু করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন এখানে বাংলাদেশের জিনিষের কদর হবেই হবে। তবে তারা কেউ বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি। নানা কারনে ব্যবসা গুটিয়ে অন্য কিছুতে লেগে আছেন। তারপর যারা এসেছেন এই ব্যবসায় তাদেরও অনেক সুবিধা অসুবিধা আছে, অনেক অভিযোগ আছে, তাদের অনেকের অনেক কাহিনী আছে। এতসব প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও যারা গ্রোসারি টিকিয়ে রেখেছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাতে হয়। আপাতত বাংলা টাউনে পাঁচটি গ্রোসারি চালু আছে। সরকার ফুডস, শাহজালাল গ্রোসারি, মারহাবা সুপার মার্কেট, মিষ্টার বাংলাদেশ এবং বাংলা টাউন গ্রোসারি। এসব গ্রোসারির মালিকের সাথে আলাপ করলে অনেক কিছুই জানা যায়।
একজন ভুতপুর্ব গ্রোসারি মালিকের সাথে আলাপ হল। জিজ্ঞেস করলাম, শুরু করেছিলেন কেন আর ছেড়েই দিলেন কেন? উত্তরে তিনি যা বললেন তা একটা কাহিনী হয়ে যায়। সংক্ষেপে কিছু তুলে ধরছি।

‘এ দেশে যখন এলাম তখন নিজের পেশার চাকরি খুজতে লাগলাম। অনেক দিন চেষ্টা করে বুঝলাম চাকরি আমার হবে না। তার অনেক গুলো কারন। প্রথমেই বাদ পড়ি এদেশের শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, অভিজ্ঞতা নেই, তারপর আমাদের ইংরেজি কথা বলার ঢং, গায়ের রং ইত্যাদি কারনে চাকরি হয়নি। অনেক দিন বেকার থাকার পর চিন্তা করলাম একটা ছোট খাট ব্যবসা করা যায় কিনা। সামান্য কিছু টাকা তখনও অবশিষ্ট আছে। আর তখনি শুনলাম এই গ্রোসারিটা বিক্রি হবে। নিজের টাকা, কিছু ধার কর্জ করে কিনে নিলাম এই গ্রোসারীটা।
কিনার আগে আমার অংকটা ছিল এক রকম। খুব লাভজনক ব্যবসা মনে করেছিলাম। আরও ভেবেছিলাম একদম সোজা ব্যবসা। শুরু করার পর কার্যক্ষেত্রে এসে দেখলাম যা ভেবেছিলাম তা নয়। অনেক ঝামেলার ব্যবসা এই গ্রোসারি। জিনিষপত্র ঠিক দামে কিনতে না পারলে লোকশানের শেষ থাকে না। এক জায়গায় সব জিনিষ পাওয়া যায় না। এক জায়গা থেকে আর জায়গায় খুজে বেড়াতে হয়। তারপর আছে প্রতিযোগিতা। দাম এক সেন্ট বেশি হলেই হল। ক্রেতা চলে যাবে অন্যখানে। মাত্র পাঁচ সেন্টের জন্য ভাল জিনিষটা বাদ দিয়ে খারাপ জিনিষটার প্রতি ক্রেতার নজর বেশি। তারা বুঝতে চায়না ভাল জিনিষের দাম একটু বেশি হবেই। এই যেমন শাক শবজির ব্যাপারটা। একই জিনিষ ভিবিন্ন দামে ভিবিন্ন দোকানে বিক্রি হয়। চায়নিজরা শবজি কেনার সময়ই দেখে নেয় কোনটা সস্তা। যেসব সবজির আয়ূ একদিনের বেশি নয় সে সব জিনিষ খুব সস্তায় বিক্রি হয়। তারা সেই জিনিষগুলো কিনে আনে আর সস্তা দামে বিক্রি করে। বাংলা টাউন সে সব জিনিষ আনেই না। ভাল কোয়ালিটির জিনিষ আমরা আনি যা এক সপ্তাহেও নষ্ট হবেনা। অতএব দাম তো একটু বেশি হবেই। ভাল জিনিষের ভাল দাম দিতেই হবে। এদিক দিয়ে আমরা চাইনিজদের সাথে অনেক সময় পেরে উঠি না। কিছু জিনিষ আছে যা টাইনিজ দোকান থেকে কিনে এক ঘন্টার মাঝে রান্না না করলে পচেঁ যাবে। তারপরও অনেকে সস্তার পেছনে ছুটে বেড়ায়। এসব ঝামেলার জন্য সবজি রাখা বাদ দিয়ে দিতে হয়। সবজি বাদ দিয়ে দেখলাম আমার ক্রেতা অনেক কমে গেছে। তারপর আছে জিনিষ কেনা। ঠিক জায়গা থেকে ঠিক দামে জিনিষ কিনতে না পারলে গ্রোসারি ব্যবসা করা উচিত নয়। আমার কোন পুর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় সবকিছুতেই আমাকে নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। সবকিছু শুরু করতে করতে এক সময় দেখলাম আমার দ্বারা এ ব্যবসা হবে না। যার যে ব্যবসায় অভিজ্ঞতা নেই তার সে ব্যবসা করা উচিত নয়। তাই বিক্রি করে দিলাম। লোকশান যা হয়েছে তা আর পুরন হবে না।’
জিজ্ঞেস করলাম, গ্রোসারি ব্যবসাকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য কিছু বলুন শুনি।
‘উল্লেখ করার মত তো অনেক কিছুই আছে। এই দীর্ঘ সময় মুদির দোকানদারি করে আমি মুদি হয়ে গিয়েছিলাম। আমার নীতি হল কাষ্টমারের সাথে ভাল ব্যবহার করা। সবাইর সাথে সদভাব রাখতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমি ব্যবহার ভাল করলে কি হবে, ক্রেতারা অনেক সময় যাচ্ছেতাই ব্যবহার করত। মুদি হিসেবে। এ ধরনের ঘটনা খুব কম। হাজারে দুএকজন কাষ্টমার আছে যারা ব্যবহার জানে না। অনেকেই আত্নসমালোচনা করে না। যদি সবাই আত্নসমালোচনা করত তাহলে অনেকেই অনেক অসুন্দর কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারত। কিছু কাষ্টমার ছিল যারা দোকানে ঢুকেই মনে করত তিনি গভর্নর। তাকে ছাড়া আমার দোকান চলবে না। তিনিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার চৌদ্দ গুষ্টি বেঁচে আছে তার দ্বারা। কথাবার্তা শুনলে গা জ্বলে যায়। তারপরও সব সহ্য করতে হত। কাষ্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট। ধরে রাখতে হবে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। কথা শুনলে চলবে না। অনেক সময় অনেক কথা না শোনার ভান করতাম। মাঝে মাঝে মনে হত আমি গ্যাড়াকলে আটকে গেছি। না ছাড়তে পারি, না ধরতে পারি। মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত আদেশ করত যা শুনলে ব্যবসা সাথে সাথেই ইতি টানতে হয়।

আমাদের বেশিরভাগ কাষ্টমারই ভাল ব্যবহার করে। মাঝে মাঝে দুএকটা খাপছাড়া কাষ্টমার ছাড়া মনে রাখার মত কিছু নেই। তবে একটা ছোট গল্প আছে যা আমি ভুলতে পারি না। যখন তখন আমার মনে উঁকি দিয়ে যায়, আমাকে আনমনা করে দেয়। অবোধ একটা শিশুর কথা ভেবে চোখের পাতা ভিজে যায়। ’

বললাম, বলুন সে কাহিনীটা শুনি। তিনি শুরু করলেন:
‘একদিন এক মহিলা এল তার তিন বছরের একটা বাচ্চা নিয়ে। মহিলা দেখতে খুবই সুশ্রী। এসেই ভাইজান বলে কতগুলো জিনিষের অর্ডার দিয়ে বাইরে গেল। বলে গেল কিছুক্ষন পরই আসবে। সব যেন রেডি থাকে। কতক্ষন পর এসে দাম দিয়ে নিয়ে গেল। সেই থেকে মহিলা সপ্তাহে দুতিন দিন আসতে লাগল। এসেই ভাইজান কেমন আছেন বলে একটা অর্ডার দেয়। তারপর বলে কয়েক মিনিটের জন্য পাশের দোকানে যাচ্ছি, আমার ছেলেটা আপনার এখানে থাকুক। তার ভাইজান বলার ঢং আমাকে আমার ছোট বোনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি না করতে পারি না। আমার পাশে একটা টুলে বাচ্চাটাকে বসিয়ে রাখি। সবে কথা বলতে শিখেছে বাচ্চাটা। দেখতে একটা পুতুলের মত। যা বলে তাই মধুর শোনায়। আমি তার সাথে কথা বলে মজা পাই। সময় কেটে যায়। এক সময় মহিলা ফিরে আসেন, বাচ্চা এবং সদাই নিয়ে চলে যায়।
ধীরে এই বাজার সদাই আর আমার বেবি সিটিং দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। মহিলা সেই যে বাচ্চাটা আমার কাছে দিয়ে যায় ফিরে এক ঘন্টা, দুঘন্টা বা তারও বেশি সময় পার করে। কোথায় যায় আমি কোনদিন জিজ্ঞেস করিনি। করতে পারি না। পাশের দোকান কোনটা, ডাইনে বায়ে বা উপরেও দোকান অফিস আছে, কোথায় যায়? জানার কোন কৌতূহল দেখাইনি কোনদিন। বাচ্চাটা আমার কাছে থাকতে থাকতে আমার সাথে খুব ভাব হয়ে গেল। এখন মহিলা এসে আর অর্ডার দেয়না, বাচ্চাটাকে আমার কাছে দিয়ে চলে যায়। আমিও বাচ্চাটার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লাম। যেদিন আসেনা সেদিন মনে হয় আমি বুঝি কারও জন্য অপেক্ষা করছি। মাঝে মাঝে মনে হত বাচ্চাটা বোধ হয় মহিলার একটা বোঝা হয়ে গেছে। না হয় এত লম্বা সময় অন্যের কাছে রাখতে পারে না। আমার এই বেবি সিটিংটা ভালই চলছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল আর আসে না। এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম। কই, আসে না। আমি ভাবলাম হয়ত দেশে গেছে।
অনেক দিন, কয়েক মাস পর একদিন দেখি বাচ্চাটা একজন ভদ্রলোকের সাথে আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। আমি দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তোলে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আর আস না কেন আঙ্কেল?
আম্মু আসে না!
আম্মু কোথায়?
আম্মু নাই!
আম্মু নাই? এমন সময় ভদ্রলোক আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি চিনেন ওকে?
হ্যা, আমার এখানে এসে বাজার করত তার মা। আমার সাথে খুব ভাল পরিচয়। আপনি কে?
আমি ওর বাবা।
ওর মা কোথায়?
ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন, নেই। চলে গেছে।
চলে গেছে মানে কি? মারা গেছে?
না, মারা গেলে তো ভালই হত, অন্য একজনের সাথে চলে গেছে।
বলেন কী! এমন সুন্দর বাচ্চাটা ফেলে চলে গেছে! বাচ্চাটা মা হারা হয়ে গেল! এই কথা ভাবতে ভাবতে আমার চোখে জল এসে গেল।
আমি ভুলতে পারিনা বাচ্চাটার কথা, যখন তখন মনে পড়ে আর নিজের অজান্তেই আমার চোখের পাতা ভিজে যায়।’

বাংলা টাউনে বর্তমানে পাঁচটি গ্রোসারি আমাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তার আগে অনেকগুলো গ্রোসারী টিকতে পারেনি বলে হারিয়ে গেছে। অবশ্য কয়েকটা কয়েকবার হাত বদল হবার পর ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। এসব গ্রোসারি টিকে থাকার পেছনে গোপন রহস্য কি জানার জন্য দুএকজন সফল গ্রোসারি মালিকের সাথে আলাপ করেছি। যারা এ ব্যবসায় টিকে আছেন তারা সকলেই পূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। আলাপ করে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, যে কোন ব্যবসায় যার নূনতম অভিজ্ঞতা নেই সে ব্যবসা শুরু করলে তা লোকশানের খাতায় লেখা হবে।
আমাদের এই কমিউনিটিতে এই পাঁচটা গ্রোসারি চলছে শুধু বাঙালি গ্রাহকের উপর নির্ভর করেই। বিদেশি গ্রাহক আসে, তা খুবই নগন্য। বিদেশির উপর নির্ভর করে বাংলা গ্রোসারি চালানো সম্ভব নয়। তাই বাঙালি গ্রাহকের সহযোগিতাই একান্ত কাম্য। বাঙালি গ্রাহক এবং গ্রোসারি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে একটা গ্রোসারির ভাগে যা পড়বে তা দিয়ে হয়ত কোন রকমে চলতে পারে। যখন কোন কোন গ্রোসারিতে এই সংখ্যা বেশি হয়ে যায় তখন অন্যের ভাগে কম পড়ে। তখনই দেখা যায় তাদের অংক মিলে না। প্রশ্ন আসে ব্যবসা গোটানোর। তাই আমাদের উচিত বিদেশি গ্রোসারি থেকে গ্রোসারি করা কমিয়ে দেয়া বা বাদ দেয়া। আমাদের সহযোগিতা না থাকলে গ্রোসারি টিকে থাকার প্রশ্ন আসে। আর গ্রোসারি বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে আমাদের রসনা অতৃপ্ত থাকা। বেঁচে থাকতে হলে গ্রোসারি কিনতেই হবে। হোক সেটা

দেশি বা বিদেশি। গ্রোসারি সকলের প্রয়োজন। বাংলা টাউনে সবাইর ভাগে যাতে সমভাবে ভাগ দেয়া যায় সেদিকে খেয়াল রেখে আমি যা করি তা হল প্রত্যেক সপ্তাহে একেকটা গ্রোসারি থেকে কেনা কাটা করি। অবশ্য পয়সা দেয়ার সময় আমি যা খেয়াল করি তা হল ওজন। ইলেট্রনিক ওজনের মেশিনে একটা চুলেরও ওজন হয়। তাই খেয়াল রাখি ওজন ঠিক আছে কিনা। কারন আমি অন্যের কথায় কান দেইনা। ভুল মানুষের হতেই পারে। অনেকের অনেক অভিযোগ আমি খুব গুরত্ব দেইনা। তারপর দেখি হিসাব ঠিক আছে কিনা। কয়টা আইটেম, কত করে কত হল, সবশেষে দেখি মোট অংক ঠিক আছে কিনা। এসব খেয়াল করলেই ওজনের হেরফের থেকে অভিযোগের উর্ধ্বে থাকা যায়। দামের হেরফেরের প্রশ্ন আসে না।

বাংলা টাউনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, শুধু বাঙালি নির্ভর। উদ্দেশ্য শুধু বাঙালি গ্রাহক। বিদেশি পাওয়া গেলে সেটা হবে ফাও। যেমন গ্রোসারি ব্যবসা। অন্য দেশি মাঝে মাঝে কিছু আসে। তার উপর নির্ভর করে গ্রোসারি চলবে না। তার মাঝে মানি এক্সেচেঞ্জও একই গ্রুপে পরে। বিদেশিরা টাকা বেচা কেনা করতে আসে না আমাদের মানি এক্সেচেঞ্জগুলোতে। বাঙালিরাই প্রধান গ্রহক। বইএর দোকান। বাঙালি ছাড়া কোন ক্রেতা নেই। দুই, অন্যান্য ব্যবসাগুলো বাঙালি এবং বিদেশি দু ধরনের গ্রাহক নিয়েই টিকে আছে। শুধু বাঙালি গ্রাহকের উপর নির্ভর করে সে সব ব্যবসা চলেনা। যেমন কম্পিউটার, একাউন্টিং, ইন্সুরেন্স, আরইএসপি, রিয়েল এষ্টেট, রেস্টুরেন্ট, মর্গেজ ইত্যাদি। এসব ব্যবসা বাঙালি এবং বিদেশি গ্রাহক নিয়ে বেশ ভালো করছে। বিনোদন ব্যবসা বাঙালি নির্ভর হলেও ইন্ডিয়ান/পাকিস্তানি কিছু গ্রাহক আছে। তবে উল্লেখ করার মত নয়।
বাসস্থান, কর্ম এবং খাদ্যের ব্যবস্থা হবার পরই মানুষের প্রয়োজন হয় বিনোদনের। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবসাদ নেমে আসে দেহে মনে। সেই অবসাদ দুর করার জন্য চাই কিছু বিনোদন। এই নাগরিক স্বাধীনতার দেশে মনের খোরাক জুগানোর অনেক পথ খোলা আছে। নির্ভর করে কে কোন্ পথ বেছে নেবে। আমাদের কমিউনিটির বেশিরভাগ মানুষ চায় আমাদের সংস্কৃতির মাধ্যমে মনের খোরাক জোগাতে। চায় আমাদের দেশীয় ছবি, নাটক, গান ইত্যাদি। এক যুগ আগে এসব বিনোদনের চাহিদা থাকলেও কোন ব্যবস্থা ছিল না। বাঙালির চাহিদা মিটানোর জন্য এগিয়ে আসেন জনাব শামসুল আলম। ১৯৯৬ সালে তিনি শুরু করেন বিনোদনমুলক ব্যবসা। প্রিয়াঞ্জান নামে এই প্রতিষ্ঠানটি এখনও আমাদের সেবা দান করে যাচ্ছে। তাতে বাংলা ছবি, নাটক, অডিও, ভিডিও সব পাওয়া যায়। এখন বিনোদনের জন্য আরও বেশ কয়েকটা ব্যবসা আমাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আমরা হাতের কাছে সবকিছুই পাই। চাহিদা অনুযায়ী ব্যবসার পরিধি বেড়েছে। যোগ হয়েছে আরও নতুন নতুন পণ্যের। বিশেষ করে বই। এখন বিনোদনমুলক পণ্যের সাথে যোগ হয়েছে বই যা অনেক আগেই ছিল স্বল্প পরিসরে। এখন দেখা যায় বইএর বিপুল সমাহার।
বই পাগল যারা তারাই বইএর ব্যবসা করতে চায়। বইএর ব্যবসা প্রথম শুরু করেন সাদি আহাম্মদ। অন্যমেলা নামে এই বইএর দোকানটি গ্রাহকের চাহিদা মিটিয়ে আসছিল। যদিও তখন খুব বেশি পড়ুয়া ছিলনা। লোকশান দিয়ে চলছিল ব্যবসা। পরবর্তিতে হয়ত বা কাষ্টমার সার্ভিস বলে একটা কথা আছে তার কারন নাকি অন্য কোন কারনে ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু বইএর চাহিদা বাড়তে থাকে। সেই চাহিদা অনুযায়ী এখন আরও দুটি বইএর দোকান চালু হয়েছে। তার মধ্যে এটিএন মিউজিক প্লাসে বিপুল বইএর মজুদ। বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান সব লেখকের বই, দুই বাংলার সব ধরনের মেগাজিন, হিন্দি বাংলা সব ধরনের ছবি, নাটক, গান, গজল, অডিও ভিডিও কেসেট ইত্যাদি। দোকানে ঢুকলে মনে হয় বাংলাদেশে কোন একটা বইএর দোকানে এলাম বুঝি। পছন্দের একটা বই হাতে নিয়ে পড়তে বসে যাই।
ব্যবসায় যারা সফল হয়েছেন তাদের সাথে পরবর্তিতে একে একে আলোচনা করব।

-o-

বাংলা টাউনে গেলে অনেকের সাথেই দেখা হয়ে যায়। আদান প্রদান হয় কুশলাদি, খবরাখবর। সেদিন এমনি সরকার ফুডসএর সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট টানছিলাম। রাস্তার ওপার থেকে ছুটে এল দুলাল। অনেক দিন পর তার সাথে দেখা। বাংলাদেশে একই পাড়ায় আমাদের বাস। বড় ভাই হিসেবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। কাছে এসেই পায়ে ধরে সালাম করে জিজ্ঞেস করল, ওস্তাদ, শরীরটা কেমন আছে? বলা বাহুল্য, পায়ে ধরে সালাম করাটা কিন্তু তার ঢং। কিছু একটা বলবে যার ভাষা শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। ঢাকাইয়া ভাষার ছন্দে সে কথা বলে। এমন সব শব্দ ব্যবহার করে যা আমি উচ্চারন করতে পারব না। তার প্রতিটি কথায় কৌতুক ঝরে পড়ে। আর প্রতিটি কৌতুকের পেছনে একটা অর্থ থাকে। মুখের উপর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পিছপা হয়না। যা উচিত মনে করবে তাই বলে দিবে। কে বেজার হল, কে খুশি হল তাতে তার কিছু যায় আসেনা। বলল, ওস্তাদ একদম সময় পাইনা। আপনার একটা খবরাখবর নিয়ার পারি না। অখন কন ...হঠাৎ রাস্তার ওপারে তার চোখ গেল। একটা লোক গ্রোসারিত ঢুকল। সেদিকে তাকিয়ে একটা গালি দিল, ...র পোলা! আবার বাজার করতে আইছে! কয়টা লাগাইয়া দিমু নাকি ওস্তাদ?
ও তোমাকে কি করেছে যে লাগাইয়া দিতে চাও?
জানেন ওস্তাদ, ওর মা আমারে কি কইছে?
কি কইছে?

কইছে, আমারে তুমি একটা টিকেট দিতে পারবা? আল্লাহর দোয়াই তোমার, একটা টিকেট দেও, আমি আর একদিনও এখানে থাকতে চাইনা। না খাইয়া মরমু, তবু আমি দেশে যাইতে চাই। যদি না দেও তাইলে আমি বিষ খামু কইয়াই কাইন্দা দিছে। আর কথা কইতে পারে নাইক্কা। তাইলে হুনেন সব কথা। হুইন্যা কন এই ...র পোরে কয়টা দেওনের কাম কিনা

দুলালের গল্পটা শুনলাম। গল্পটা এরুপ:
লোকটার নাম মুহাম্মদ আফসারউদ্দিন চৌধুরী। তার মা আদর করে ডাকে সোনা মানিক। এখন সে মানিক নামেই পরিচিত। তবে সবার কাছে আদরের নয়। তাদের গ্রামের বাড়ী টাঙাইল ছাড়িয়ে একটা অজ পাড়াগায়ে। এখন বাস করে বাংলা টাউনের পেছনে এক মহা অট্টালিকায়। তার বাবা ছোটখাটো চাকরি করত ওয়াপদায়। থাকত ঢাকার গোড়ানে। তখন ওসব এলাকায় মানুষজনের বসতি তেমন ছিল না। মনে হত শহর থেকে অনেক দুরে। তাই জমিজমা ছিল সস্তা। গোড়ানের উত্তরে মেরাদিয়া ছিল নীচ জমি। সেখানে আরও কয়েকজনের সাথে মিলে মানিকের বাবা একটু জায়গা কিনেছিল পানির নীচে। পানির দামে। স্বাধীনতার পর সেই পানির জায়গা হয়ে গেল স্বর্নের দাম। কয়েক শ টাকার জায়গার দাম হল কয়েক লক্ষ টাকা। তখন মানিকের বাবা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখল। সেখানে বাড়ী করবে, পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে কাটাবে। কিন্তু বাড়ী করার মত টাকা তার নেই। অফিস থেকে লোন যা পাবে তা দিয়ে বাড়ী হয় না। তাই সে জমির কিছুটা অংশ বিক্রি করে, অফিসের লোনের টাকা মিলিয়ে জমিতে মাটি ভরাট করে একটা ঠিনের ঘর তৈরি করল। তাদের মনে এখন তৃপ্তি। নিজের একটা বাসস্থান হল। মানিকের বাবার এই সুখ সইলনা, একদিন হঠাৎ করেই তিনি মারা গেলেন। সংসারে নেমে এল একটা ভয়ঙকর অবস্থা। মানিকের বয়স তখন মাত্র ১৬ আর তার একমাত্র বোন সীমার বয়স ১২। কোন আয় নেই। কি দিয়ে চলবে এই তিন জনের সংসার। মানিক সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে। সবেমাত্র কলেজে পা দেয়া মানুষের জন্য পৃথিবীর কোথাও কিছু নেই। না পারে তারা লেবারের কাজ করতে, না পায় অন্য কোন কাজ। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন দামই থাকেনা। তাই মানিকের ভাগ্যেও কোন কাজ জোটেনি। তার মা আত্নীয়স্বজন থেকে ধার কর্জ করে অতি কষ্টে সংসার চালাতে লাগল। মানিক তার মায়ের কষ্ট দেখে উপায় খুজতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একটা সুযোগ পেল বিদেশে যাবার। তার দুর সম্পর্কের এক আত্নীয় আদম ব্যবসা করত। মানিক তার সাহায্যে বিদেশে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা ঠিক করে তার মাকে বলল। মা দেখল ছেলেটাকে বিদেশ পাঠাতে পারলে দু:খ লাঘব হবে। কিন্তু টাকা জোগার হবে কি করে? সাব্যস্থ হল, বাড়ীর অর্ধেক অংশ বিক্রি করে টাকার ব্যবস্থা করা। সেভাবেই ব্যবস্থা হল। মানিক শেষ পর্যন্ত কানাডায় এসে পৌছল। রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে পেয়ে গেল। মানিক তার মাকে লেখল, মা তোমার আর দু:খ থাকবে না। তোমাকে রাজরানী করে দিব। তুমি যা চাও তাই পাবে। সে আজ পনের বছর হল।
মানিক একটা বড় কাজ করল। তার ছোট বোনকে বিয়ে দিল রাজকীয়ভাবে খরচ করে। বিয়ের পর বাড়ীতেই থাকতে দিল। কারন বাড়ীর এই অর্ধেক অংশ তার বোনেরই পাওনা।
২০০০ সালের কথা। কানাডার নাগরিকত্ব পেয়ে মানিক একদিন দেশে গেল। মা তারঁ সোনা মানিককে পেয়ে আনন্দে দিশেহারা। মায়ের ইচ্ছে, সব মায়েদের যা হয়, এই মানিকের জন্য একটা টুক টুকে বউ। বেশ খোজাখুজির পর টুক টুকে বউ পাওয়া গেল। মানিকের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। স্ত্রী সীমাকে নিয়ে মানিক ফিরে এল কানাডায়। আসার সময় মাকে বলে এল, এবার গিয়েই তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। শান্তির দেশে থাকবে পরম শান্তিতে। যা চাবে তাই পাবে। কোন কিছুর অভাব থাকবে না।

সেই আসার আশায় থাকতে থাকতে মা এসে পৌছলেন ২০০৮ সালের শেষের দিকে। ভুল কাগজ দাখিল করার মাসুল দিতে হয়েছে দু দুবার। দু হাজার সাল থেকে দু হাজার আট সাল। এই আট বছরে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের পরিবর্তন হয়েছে। মানিক এবং সীমার পরিবর্তন হয়েছে। মানসিক এবং দৈহিক। মানিক কাজ করে একটা চেইন ষ্টোরে আর সীমা কাজ করে ফার্ষ্ট ফুডে। আগের সেই সীমা আর নেই। খুব চটপটে হয়েছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। মানিকের দুই পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছে। এখন তাদের বয়স যথাক্রমে সাত ও ছয়। তারা স্কুলে যায়। মানিকের মায়ের পরিবর্তন হয়েছে অনেক। আগে দ'একটা চুল কালো ছিল, এখন সব সাদা। বৃদ্ব বয়সে মানুষের যা হয় সে সব অনেক রোগ এসে ভর করেছে। চলাফেরায় খুব কষ্ট হয়।
মা যেদিন এসে পৌছলেন সেদিন মানিক আর সীমা দুজনেই ছুটি নিয়ে মাকে বরন করে নিয়ে এল এয়াপোর্ট থেকে। সোনা মানিক আর সোনা মানিকের সন্তানদের পেয়ে মা সুখের স্বপ্ন দেখে চোখে জল এসে গেল। মানিকের দু সন্তনকে বুকে জড়িয়ে ধরে এসে ঘরে পৌছলেন।
মানিকের বাসা দু বেডরুমের। এক রুম মায়ের জন্য। সুন্দর পরিপাটি বিছানা দেখিয়ে সীমা বলল, মা এই আপনার ঘর, এই বিছানা। পাশে আর একটি বিছানা দেখিয়ে বলল, আর এটা হল অলক আর পুলকের।

তারপর ঘরের কোথায় কি আছে সব দেখিয়ে বলল, বাথরুম ব্যবহার করার পর পরিষ্কার করে ফেলবেন। কিভাবে কি করতে হবে সব দেখিয়ে দিল। ঘরে কোথায় কি আছে, খাবার কোথায়, ফ্রিজে কি কি আছে সব দেখিয়ে দিল।
খাওয়া দাওয়ার পর মানিক আর সীমা মাকে নিয়ে অনেক গল্প করল। গল্পশেষে বলল, আমরা সকালে কাজে চলে যাব, **অলক পুলক** চলে যাবে স্কুলে। আপনি একাই থাকবেন ঘরে। ফ্রিজে খাবার আছে, আপনার ইচ্ছেমত খেয়ে নিবেন। কেউ দরজায় ধাক্কা দিলে খুলবেন না। এখন ঘুমাতে যান।
নতুন দেশ, নতুন ঘর, নতুন বিছানায় শুয়ে মায়ের ঘুম আসে না। তিনি অনেক কথা ভাবছেন। জীবনের অনেক পেছনে চলে গেছেন। কোন্ এক অজ পাড়াগায়ে তাঁর জন্ম, তারপর বিয়ে, বিয়ের পর ঢাকা শহর, সেখানকার কষ্টের জীবন, আজ কানাডায় সোনা মানিকের ঘরে রাজরানীর বিছানায়। কে ভাবতে পেরেছিল আমি কানাডায় আসব! আমার সোনা ছেলে কথা রেখেছে! আমাকে রাজরানী করেছে! আমি সুখি। কিন্তু একটা জিনিষ তিনি খোজে পাচ্ছেন না। তার টুকটুকে বউ। সেই টুক টুকে, মৃদুভাষী, ভীরু চাহনীর সেই সীমা কোথায়? সেই সীমার সাথে এখনকার সীমার কোন মিল নেই। প্রতিটি কথা টন টনে। রুক্ষ কথাবার্তা। তিনি ভাবলেন এ দেশের নিয়মই বুঝি তাই। পাশের বিছানায় তার দুই মানিক ঘুমিয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন ওরা আলাদা থাকবে কেন? আমি ওদেরকে বুকে জড়িয়ে ঘুমাব। দুটা বিছানার দরকার নেই। মানিককে বলব একটা বিছানা হলেই চলবে। এমনি ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখেন ঘরে তিনি একা। অভ্যাসবশত: তিনি ওজু করার জন্য পানির খোজ করলেন। বেসিনে ওজু করতে গিয়ে নীচে বেশ কিছু পানি পড়ে গেল। কারন বেসিনে পা ধোয়া তাঁর জন্য খুব কষ্টকর। নামাজ পড়ে তিনি ফ্রিজ খুলে দেখলেন খাবার কি আছে। কোন কিছুই তার পছন্দ হলনা। আধা গ্লাস দুধ খেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলে ওরা কখন ফিরবে।
বিকেলে এক মহিলা অলক পুলককে ঘরে দিয়ে চলে গেল। নাতিদের পেয়ে তিনি দিশেহারা। কি খাবে ওরা? তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। ওদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি খাবে? দুজন একসাথে উত্তর দিল, কিছুই খাব না।
তা কি করে হয়! তিনি ফ্রিজ থেকে রুটি বের করে দিলেন, দুধ দিলেন, দুটা আপেল দিলেন। ওরা কিছুই স্পর্শ করল না। দুজনে খেলা নিয়ে ব্যস্ত রইল।
বেলা পাঁচটার দিকে সীমা ঘরে ফিরল। এসেই সে তার ছেলেদের খবর নিল। কে কি খেয়েছে। তারপর মাকে জিজ্ঞেস করল কি খেয়েছে। সীমা বাথরুমে গেল মুখ হাত ধোয়ার জন্য। একি! চারদিক এত পানি কেন? সে তার ছেলেদের চিৎকার করে ডাকল। কে পানি ফেলেছে? ওরা এক সাথে উত্তর দিল আমি বাথরুমে যাই নাই। তাহলে কে ফেলেছে? মাকে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, ওজু করার সময় পড়ছে মনে অয়।
আপনাকে না বলেছি বাথরুম পরিষ্কার রাখতে হবে। ব্যবহার করার পর দেখবেন কোথাও পানি পড়েছে কিনা, তারপর মুছে ফেলবেন। এই যে এখানে টিসু পেপার আছে। আরে! এখানে ভিজা কাপড় কে রেখেছে?
আমি গোসল করছি। কাপড় কই মেলমু জায়গা পাইলাম না। ত এইখানেই রাইখা দিছি। ভাবলাম তুমি আইলে জিগামু। এদেশে কাপড় ভিজিয়ে কেউ গোসল করে না। কাপড় শুকাবার জায়গা নেই। মেশিনে কাপড় ধুই, মেশিনেই শুকাই। সবকিছু আপনাকে শিখতে হবে। শাড়ী ভিজিয়ে আর গোসল করবেন না। আপনাকে দেখিয়ে দিব কোথায় কাপড় ধোয়ার মেশিন, কিভাবে ধুতে হয়। একদম সোজা।
মা বোকার মত সীমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।
ঘন্টাখানেক পর মানিক এল। এসেই মার পাশে এসে বসল। বলল, এ দেশটাই এমন। সবাই ব্যস্থ থাকে যার যার কাজে। কেউ কাউকে সাহায্য করতে সময় পায় না। তুমি তোমার নিজের প্রয়োজন যা তার জন্য সর্বকিছু শিখতে হবে। নিয়ম কানুন জানতে হবে। সীমা তোমাকে সব শিখিয়ে দেবে। প্রথম প্রথম অসুবিধা হয়, জানা হয়ে গেলে অসুবিধা হয়না।
এক সপ্তাহের মাঝে সীমা সব শিখিয়ে দিল। প্রথমেই নিয়ে গেল অলক পুলকের স্কুলে। স্কুল বাসার কাছেই, দশ মিনিটের পথ। সকালে কখন নিয়ে যেতে হবে, আবার দুটার সময় স্কুল থেকে নিয়ে আসতে হবে। স্কুল থেকে আসার পর কি খাবার দিতে হবে। রান্নাঘরের সর্বকিছু দেখিয়ে দিল। কোন জিনিষ কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। রান্নার জিনিষ কোথায় থাকে, মসলা, হাড়িপাঁতিল কোথায় সব বুঝিয়ে দিল। সবশেষে বলল, খাওয়ার পর বাসনকোশন ধুয়ে ফেলতে হবে। কোন হাড়িপাঁতিল বেসিনে থাকবে না। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে। এখানে কোন কাজের লোক নেই। নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে হয়। যখন যা প্রয়োজন সাথে সাথে করে ফেলতে হয়।
তারপর খাবার তৈরির কায়দাকানুন। অলক পুলক কি খায়, তাদের সেন্ডুইচ কি দিয়ে তৈরি করতে হবে, রুটি কোন জাতের, কোন জিনিষ কত পরিমান দিতে হবে। বেশি কম হলে ফলাফল কি সব বলে দিল।
এক সপ্তাহ পর থেকেই মায়ের যাত্রা শুরু হল। সকালে অলক পুলককে স্কুলে পৌছে দেয়, বিকালে নিয়ে আসে। খাবার তৈরি করে, খুব তোষামোদ করে খাওয়ায়। কিন্তু নিজে কিছুই খেতে পারেন না। এসব খাবার তাঁর মুখে রোচে না। মসলা ছাড়া রান্না হয়। মা'র কাছে মিষ্টি লাগে। সেদিন রাতে সীমাকে বলেই ফেললেন, আমি তো তোমাদের মুরগী খাইতে পারি না। এদেশে মাছ তরকারি নাই
ওরা তো মুরগী ছাড়া কিছু খায় না। মসলা দিলে ওরা খেতে পারে না। আর মাছ তরকারি রান্নার সময় কোথায়?
তোমরা আইনা দেও, আমিই রানব।

বাজারে যাবার সময় নাই। এগুলিই খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। যে দেশের যে খাবার তাই খেতে হবে। আলাদা কিছু করা সম্ভব না।
সব সময়ই কি মুরগী খাও?
না, তবে অলক পুলকের জন্য আমরাও অন্য কিছু খেতে পারি না। মাঝে মাঝে অন্যকিছু রান্না হয়। ওরা বেশিরভাগ সময় সেন্ডুইচ খায়, ভাত দিলে মুরগী ছাড়া খায় না। সবজি দিলে কান্না শুরু করে।
আমি দ এসব খাইতে পারি না।
বললাম না, অভ্যাস করতে হবে। প্রথম প্রথম আমিও খেতে পারতাম না। এখন শিখে ফেলেছি। আপনাকেও শিখতে হবে। শুধু খাবার নয়, সর্বকিছুই শিখতে হবে।
সকালে সীমা ঘুম থেকে উঠেই অলক পুলককে ডেকে উঠায়। স্কুলের জন্য প্রস্তুত হতে বলে। সেদিন ওদের ডাকতে গিয়ে দেখে মা'য়ের বিছানায়, মায়ের দুদিকে দুজন মাকে জড়িয়ে ধরে আরামে ঘুমাচ্ছে। সীমা রেগে গেল। টেনে ওদেরকে উঠাল। বলল, এই বিছানায় কে বলেছে ঘুমাতে?
দিদি বলেছে। দিদি গল্প বলে খুব সুন্দর।
সাবধান, আর ও বিছানায় শুবে না। তোমাদের বিছানায় তোমরা ঘুমাবে। মায়ের দিকে ফিরে বলল, ওদেরকে আপনার বিছানায় জায়গা দিবেন না। ওরা আলাদা থাকার অভ্যাস করুক।
মায়ের বাতের ব্যাথা, বদহজম, গলা জ্বলে, একটা পা জোর পায় না। কয়েকদিন যাবত কিছুই খেতে পারে না। মানিক এসব শুনে মাকে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। ঔষদ দিল। ঔষদ খেয়ে অনেকটা সুস্থ হলেন। এখন খিধা লাগে। কিন্তু খাবার কোথায়! এসব খাবার তো মুখে রুচে না।
একদিন সকালে কাজে যাবার সময় সীমা বলল, এই মুরগীগুলো পরিষ্কার করে ফ্রিজে রেখে দেবেন। আমি এসে রান্না করব।
আর একদিন সীমা বলল, আজকে অলক পুলকের সাথে আরও দুটি বাচ্চা আসবে আপনার সাথে। এখন থেকে ওরা অলক পুলকের সাথে থাকবে বিকাল সাতটা পর্যন্ত। তারপর ওদের মা এসে নিয়ে যাবে। অলক পুলককে যা খেতে দেন ওরাও তাই খাবে। ওরা অলক পুলকের বন্ধু।
সেই থেকে মা চারটি বাচ্চার দেখাশোনা করেন। ওদের খাবার তৈরি করে ন। নজর রাখেন যাতে ঝগড়া না করে।
আর একদিন সীমা একটা রাইচ কোকার দেখিয়ে বলল, এটাতে তিন কাপ চাউল আর .... কাপ পানি দিয়ে বসিয়ে দিবেন। এই সুইচটা অন করে দিবেন। তারপর আপনার আর কিছু করতে হবেনা। এমনিতেই ভাত হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। এটা বসাবেন বিকাল চারটার সময়। ঐযে ঘড়ি। ঘড়ির কাটা যখন এই বরাবর আসবে তখন।
যখন প্রয়োজন তখনই মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় মানিক। একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে। একদিন মানিক বাজার করতে বাংলা টাউনে এল। অনেক বাজারের সাথে সে একটা টেংরা আর একটা কেচকী মাছের পেকেট নিল। টেংরা মাছ দেখে মা খুশিতে টগবগ করে উঠল। এখানে এসব মাছ পাওয়া যায়?
হ্যা, সব মাছ পাওয়া যায়।
তাইলে এদ্যিন আনলা কিরে?
সময় পাইনা, তাছাড়া সীমা এসব রান্না করে না। তাই আনা হয় না।
আমি রান্ধুম। তোমরার এই মুরগী আমি খাইতে পারি না। কত দিন পেট ভইরা ভাত খাইনা। আজকে খামু। আমিই রান্ধুম।
কতক্ষন পর সীমা এসে বাজার কোনটা কোথায় যাবে ঠিক করে রাখছে। মাছগুলো সে ডিপ ফ্রিজে রাখতে গেল। মা বলল, মাছ অখন রানবা না?
না, আজকে সময় নাই। কালকে রান্না করব।
আমি ত মনে করলাম আজকাই রানবা। আচ্ছা, তোমার সময় না থাকলে আমিই রানমু। মসলা না থাকলে কাচামরিচ আর পেয়াজ অইলেই চলব।
আপনার কষ্ট করে লাভ নাই। একদিনের জন্য এমন কিছু হবে না। কাল আমিই রান্না করব।
পরের দিন সেই মাছ রান্না হল। মা পেট ভরে ভাত খেলেন অনেক দিন পর। মনে মনে বললেন, ওদেরকে বলব, বাকি মাছগুলো আমার জন্য রেখে দিতে। ওরা তো মুরগী খেতে পারে।
সবশেষে মানিক খেতে এল। মাছ পেয়ে সেও লাগামছাড়া খাওয়া খেল। বাকী যা ছিল প্রায় সব শেষ। পরে কেচকীর অবস্থাও তাই। দুবেলা খাওয়ার পর আর অবশিষ্ট ছিল না।
মা অপেক্ষা করেন কখন মানিক আবার বাজারে যাবে, মাছ আনবে। অপেক্ষার শেষ নেই। একদিন বলেই ফেলল, মানিক আর দেখি তুমি মাছ আন না।
সীমা উত্তর দিল, মাছ রান্না করলে ঘর গন্ধ হয়ে যায়। ছেলেরা নাকে আঙ্গুল দেয়। ওরা মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। তাই মাছ আনে না। তবে আপনার জন্য সপ্তাহে একদিন মাছ হবে।
একদিন অলক পুলক হোম ওয়ার্ক শেষ করে খেলছে। এক সময় অলক পুলককে বলল, দিয়াহাইলছি। শব্দটা সাথে সাথে সীমার কানে গেল। দৌড় দিয়ে এসে অলকের চুল ধরে, যা সে কোন দিনই করেনি, জিজ্ঞেস করল, এই শব্দ কোথা থেকে শিখলে?

দিদি বলেছে।
এ্যা! এসব বাংলা শিখছ তোমরা? এসব শব্দ আর বলবে না বলে দিলাম। এগুলি আসল বাংলা শব্দ নয়। বলে সে মায়ের কাছে গেল। বলল, আপনি এসব কি বাংলা শিখাচ্ছেন ওদের? ওদের সাথে এসব বাংলা বলবেন না আর!
তাইলে কি বাংলা কমু? আমি ত আর কিছু জানি না।
আপনার জানতে হবে। আরা যে ভাষায় কথা বলি তা বলতে পারেন না?
নতুন কইরা আবার কি শিখুম?
না, একটা ব্যবস্থ মা করতে হবে বলে সীমা তার ঘরে চলে গেল।
মা স্থির দৃষ্টিতে ওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আকাশ পাতাল কি ভাবছেন কে জানে!
কাজ থেকে ফিরে ঘরে এসেই মানিক মায়ের কাছে যায়। পাশে বসে গল্প করে। কি খেয়েছে জিজ্ঞেস করে। প্রায়ই বলে, আস্তে আস্তে সব শিখে ফেল। এদেশে থাকতে হলে সর্বকিছুই জানতে হবে, শিখতে হবে। যা বুঝতে পারনা তা সীমার কাছ থেকে জেনে নিও।
ছুটির দিনে মানিক বাজারে গেল। বাংলা টাউন থেকে কয়েক রকমের মাছ নিয়ে এল। এসব দেখে সীমা রেগে আগুন। এতসব মাছ কে রান্না করবে? ছেলেরা মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। ঘরে মাছের গন্ধ হয়ে যায়। এত মাছের কি প্রয়োজন ছিল?
মা তো মাছ পছন্দ করে। তাই আনলাম।
মানুষের সব পছন্দ তো পুরন করা যায় না। আর এটা তো এমন নয় যে না খেয়ে মানুষ বাচবে না। মাসে দুতিনদিন হলেই তো চলে। আমার ছেলেদের দিকটা দেখতে হবে আগে।
মানিক চুপ করে গেল।
এখন মায়ের দৈনন্দিন কাজ হল সকালে স্কুলে দিয়ে আসা, বিকালে নিয়ে আসা, চারটি বাচ্চার খাবার তৈরি করা এবং যখন তখন ঝগড়া থামানোর দায়ীত্ব নিয়ে তাদের চলাফেরায় চোখ রাখা। রান্নাঘর পরিষ্কার, বাসকোশন পরিষ্কার করা, বাথরুম পরিষ্কার রাখা। আর সীমা যেদিন যে কাজ দিয়ে যায় তা সমাধা করা।
মাঝে মাঝে কোন ছুটির দিন সবাই বেড়াতে যায়। মানিকের একটা পুরনো টয়োটা আছে। সামনের সিটে সীমা বসে, পেছনে মা আর দু নাতী। কোন কোন দিন পুরনো টাউনে ঘুরে, কোন দিন লেকের পাড়ে, কোন পার্কে বা কোন বাসায়। মা খেয়াল করেছেন সব কাজেই সীমার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত। মানিকের কোন বলার নেই। সীমা যা করে সব ঠিক। দুলালের বাসায় এসেছে কয়েক দিন। সেই সুবাদে দুলালের সাথে মায়ের খুব ভাল সম্পর্ক হয়েছে। বিশেষ করে দুলালের কথাবার্তায় মা খুব খুশি। যখন তখন দুলাল আসে বা মা ডেকে পাঠায়। ওর কথাবার্তা শুনলে মায়ের মনটা খুব খুশি থাকে।
রাতে বিছানায় গেলে মায়ের ঘুম আসে না। কোন কোন রাত জেগেই কাটিয়ে দেন। জেগে জেগে জীবনের দেনা পাওনার হিসেব করেন। তার নাতিদের সাথে বাংলা বলতে পারেন না, তাদের বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারে না। পেট ভরে খেতে পারেন না। দেশে থাকতে সুখে না থাকলেও শান্তিতে ছিলেন। স্বাধীন জীবন ছিল। এখানে, এই সীমিত গন্ডির ভেতর তিনি হাপিয়ে উঠেন। একটা ঘরের মাঝে আবদ্ধ। ইচ্ছেমত কোথাও যাওয়া যায় না। মনে মনে বিগড়ে যান। প্রয়োজন নেই আমার এই রাজরানীর জীবনে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন দেশে ফিরে যাবেন। অনেকদিন থেকে ভাবছিলেন মানিককে বলবেন কথাটা। কয়েক দিন বলতে গিয়েও বলতে পারেননি। সেদিন রাতে যখন মানিক মায়ের পাশে বসে গল্প করছিল তখন কথাটা বলে ফেললেন। বাবা মানিক, আমি দেশে যামু। তুই আমারে পাঠানের ব্যবস্থা করে দে।
এ্যা! বল কী? দেশে গেলে কে তোমার দেখাশোনা করবে? না, না তোমার দেশে গিয়ে কাজ নেই। এখানে কত সুন্দর জীবন। চিকীৎসার কত সুযোগ! দেশে গেলে তো ঔষধই পাবা না।
আমার মন চায়না এখানে থাকতে। দেশের জন্য মন কান্দে। ভালা না লাগলে আবার আমু। এখন আমারে পাঠায়ে দে বাবা।
দেশে কে আছে তোমার? কার কাছে থাকবা?
আমার মেয়ে নাজনিনের কাছেই থাকুম। আগে যেমন আছিলাম। ওতো আমারে ফালাই দিবে না। না পারলে তুমি তো আছই।
এই চিন্তাটা বাদ দাও মা। এদেশে আসলে কেউ ফেরত যায় না। মানুষ কত চেষ্টা করে এদেশে আসার জন্য। আসতে পারে না। আর তুমি এসে গেছ। ফেরত যাবার চিন্তাও করোনা। পরের কথাগুলো বলার সময় মানিকের সুরে একটা রাগের ভাব ছিল।
মা জেদ ধরেই আছেন। না, আমি এখানে থাকুম না বাবা। আমার মন দেশে যাওয়া লাইগ্যা পাগল অইয়া গেছে। আমারে পাঠাইয়া দে।
আচ্ছা দেখি কি করা যায়, বলে মানিক উঠে গেল।
কয়েক দিন অপেক্ষা করে মানিককে আবার মনে করিয়ে দিলেন। মানিক উত্তর দিল, এখন না, পরে চিন্তা করব।
আরও কয়েক মাস অপেক্ষা করে যখন দেখলেন মানিক কোন ব্যবস্থাই করবে না তখন দুলালকে বললেন। এখানে দুলালের নিজের ভাষায় কথাগুলো উদ্বৃত করা গেল: ও পাঠাইব কেন, অখন দ হালায় নিজের বেবি সিটিংএর পয়সা

দিতে অয়না, উল্টা তার মা বেবি সিটিং করে, টেকা কত পায় তার মায় জানে না। তার মার লাইগ্যা সরকার থাইক্যা টেকা পায়। এইডাও তার মা জানে না। তার মারে দেশে পাঠাইলে এই টেকাগুলি বন অইয়া যাইবো। আর সব কাম আবার নিজেরাই করতে অইব। তাই হালায় মারে পাঠাইব না। অহন কন, তারে কয়টা দেওনের কাম কিনা।
দুলালের এ প্রশ্নের উত্তর আমি না দিয়ে পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম। পাঠক উত্তর দিন।
আমরা যারা প্রবাসে আছি খুব সুখে আছি কি? তারপর নিজেদের মাতাপিতাকে নিয়ে আসি সুখ দেবার জন্য। বাংলাদেশে অভ্যস্থ্য জীবন ফেলে এখানে আসার পর সবকিছুই নতুন করে শুরু করতে হয়। জানতে হয়। এই বৃদ্ধ মাতাপিতারা এদেশে আসার পর কতটুকু সুখি তা আমরা তলিয়ে দেখিনা। আমরা যারা মাতাপিতাকে এদেশে এনে সুখ দেবার চেষ্টা করি তাদের উচিত মাতাপিতার সাথে গভীরভাবে মিশে তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো জেনে নেয়া। এবং সুখদুখের বিষয়গুলো জরুরী ভিত্তিতে সমাধা করা। তা না হলে মাতাপিতাকে এদেশে এনে সুখের বদলে নির্যাতন করার কোন মানে হয়না। আমাদের সকলের উচিত এসব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

-o-

আমার কম্পিউটার ঠিকমত কাজ করছে না। কার কাছে নিয়ে যাব ভাবছি। বাংলা টাউনে এখন কম্পিউটার ব্যবসার ছড়াছড়ি। সবাই কম্পিউটারের কাজে পারদর্শি। দেশি বিদেশি গ্রাহক নিয়ে বেশ ভাল ব্যবসা করে যাচ্ছে। কারও চেয়ে কেউ কম নন। সবাই কম্পিউটারে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করেই এই ব্যবসা শুরু করেছেন। রনিকে জিজ্ঞেস করতে বলল, স্যাটা কম্পিউটারের মালিক আবুল হাসেমের কাছে নিয়ে যান। আমার বন্ধু মানুষ। দরদ দিয়ে কাজ করে দিবে। কিন্তু আমার ইচ্ছে প্রথমবার সারাব প্রথম যিনি কম্পিউটারের ব্যবসা শুরু করেছেন। খোজ নিতে বেরুলাম। জানতে পারলাম প্রথম কম্পিউটারের ব্যবসা শুরু করেন পারভেজ, ১৯৯৬ সালে। হোম কম্পিউটার নামে এই প্রতিষ্ঠান এখনও গ্রাহকের সেবা দান করে যাচ্ছে। দেশি বিদেশি সব ধরনের গ্রাহক নিয়ে তাদের ব্যবসা। তারপর দিনে দিনে বাঙালি ইমিগ্রেন্ট্ বাড়ছে, ঘরে ঘরে কম্পিউটার, কম্পিউটার থাকলে একটা না একটা খুত বের হবেই, তাই গ্রাহকের সংখ্যাও বেড়েছে। গ্রাহক সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে কম্পিউটার ব্যবসার সংখ্যাও বেড়েছে। এখন বাংলা টাউনে বেশ কয়েকটা কম্পিউটার ব্যবসা চালু আছে।
হাসেমের কাছে কম্পিউটারটা দিয়ে বাংলা টাউন একটা চক্কর দিতে বের হলাম। এটিএন মিউজিক প্লাসের সামনে এসে দেখা হয়ে গেল রবির সাথে। তিনি অনেক দিন নিখোজ ছিলেন। বাংলা টাউনে ব্যবসা করতে এসে লোকসান দিয়ে, ব্যবসা বন্ধ করে, সব হারিয়ে সে নিজেও হারিয়ে গিয়েছিল বাংলা টাউন থেকে। তার কথা বাংলা টাউন মনে রাখেনি। মানুষ ভুলে গেছে তার কথা। দেখি রবি রাস্তায় দাড়িয়ে সিগারেট টানছে। আগের রবি আর এই এখনকার রবির কোন মিল নেই। সেই স্মার্ট রবি, টিপটপ পোষাক, কথা বলার ষ্টাইল ছিল যার বিশেষত্ব, সে এখন একটা ময়লা সার্ট, ময়লা প্যান্ট পড়ে সিগারেটের শেষ মাথাটা তিন আঙ্গুলে ধরে শেষ টান দিল। কাছে যেতেই একটা বিশ্রি গন্ধ নাকে এল।
জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছ রবি? অনেক দিন দেখিনা তোমাকে। এতদিন কোথায় ছিলে?
আমার দিকে পিট পিট করে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় চিনতে চেষ্টা করছে।
রবির সাথে আমার খুব বেশি পরিচয় ছিল না। তার দোকানের ক্রেতা হিসেবে দুএকদিন আসা যাওয়া। সেই থেকেই পরিচয়। আমাকে মনে না রাখলেও তাকে দোষ দেয়া যায় না।
কি হল! চিনতে পারছনা? আমি তোমার দোকানের কাস্টমার ছিলাম। নাম হয়ত জান না। আমার নাম সন্ধানি।
সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট চেপ্টা বোতল বের করল। এক চুমুক মুখে দিয়ে বলল, হ, চিনছি।
বোতলে পানির মত তরল পদার্থ। ঠিক পানি বলে মনে হল না। কারন পানির বোতল আমার খুব চেনা। আর এক চুমুক মুখে দিয়ে খুব যতনে বোতলটা পকেটে রেখে দিল।
জিজ্ঞেস করলাম তুমি এখন কোথায় থাক, কি কর?
এখন কেন, অনেক দিন থাইক্কা কিছু করিনা। থাকি এক বন্ধুর বাসায়। ব্যবসা বন্ধ করনের পর থেইক্কা আর কিছুই করি না। কইরা কি অইব! কার জন্য করব! আমার তো আর সংসার নাই যে টাকা রোজগার কইরা সংসার চালাইতে অইব! অখন আর বাইচ্চা থাকনের ইচ্ছা নাই। সবই তো গেল! ব্যবসা করতে আইয়া সব হারাইলাম। টাকা পয়সা ছেলেমেয়ে বউ সব। আমার সেই বোতল বন্ধু কদম আর তার দোস্তই সর্বকিছুর জন্য দায়ী। তবে কদম নিজে করে নাই কাজটা। তার বন্ধু নসু আমাকে পথে বসাইছে। আমার সংসার তামা কইরা দিছে। ঐ হালারে তো ধরবার পারি নাই। পাইলে এক চোট নিতাম।
বললাম, আসল ঘটনা তো আমরা জানি না। আসলে কি হয়েছিল বলনা শুনি।
কথায় কাজ হল। সে যা পান করেছে মনে হল ইহজগতে নেই। আবার বোতলটা বের করে আর একটা চুমুক দিয়ে বলল, আসেন কোথায়ও বসি। যেখানে বাঙালি নাই সেখানে চলেন। সব বলব।
বাংলা টাউন! বাঙালি তো থাকবেই। কোথায় বসা যায়! চল একটা রেস্টুরেন্টে যাই। এক কাপ কফি খাব আর তোমার কথা শুনব।
না, না এখন কফি খামু না। কফি আমি খুব একটা খাইনা। অন্য কোথাও চলেন।
তাহলে চল বাংলা টাউনের পেছনে ডেন্টনিয়া পার্কে। সেখানে কেউ নেই, বসার জায়গা আছে।

ঠিক আছে, চলেন।
ডেন্টনিয়া পার্কে দক্ষিন পশ্চিম কোনে গাছের নীচে একটা বেঞ্চিতে আমরা বসলাম। বসেই রবি তার বোতল বের করে আর একটা চুমুক দিল। তখন বিকেল পাঁচটা বাজে। রবি তার গল্প শুরু করল।
শুনেছি মাতাল কখনও মিথ্যে বলেনা।

রবি ট্যাক্সি চালাত। রাতের শিফটে। সারা রাত ট্যাক্সি চালিয়ে সকালে ঘরে ফিরত দু একশ ডলার নিয়ে। তার স্ত্রী যমুনা আর দু বছরের মেয়ে তুলিকে নিয়ে খুব সুখেই ছিল। সারাদিন ঘুমাত। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে প্রায় প্রতিদিনই বাংলা টাউনে একটা চক্কর দিত। একদিন বাংলা টাউনে পরিচয় হল কদম আলীর সাথে। প্রথম দেখাতেই রবি বুঝতে পারল কদম খেয়ে ভাঁড় হয়ে আছে। রবিও। দুজনের আলাপ হল। আধো আধো বাংলায়। একবারে মিলে গেছে। কয়েক মিনিটের মাঝেই তারা বন্ধু হয়ে গেল। শুধু তাই নয় কদম রবিকে নিয়ে গেল তার বাসায়। রবিকে আপ্যায়ন করতে হবে। নতুন বন্ধু। কদম তার ওয়ারড্রপ খুলে দিল। বলল, কি খাবেন? সব আছে।
রবি দেখল তার ওয়ারড্রব একদম ভর্তি। লাল, গোলাপি, সাদা হরেক রকমের ছোট বড় অনেক বোতল। অনেক রাত পর্যন্ত নতুন বন্ধুর বাসায় পান করে সময় কাটিয়ে বাসায় ফিরল রবি। সেদিন আর কাজে যাওয়া হয়নি তার। কি হবে প্রতিদিন কাজ করে! জমানো টাকা তো বেশ কিছু আছে ব্যাংকে।
সেই থেকে শুরু হল দু'বন্ধুর মাঝে মাঝে স্বর্গে বাস। রবিকে যখনই কল করে রবি চলে আসে। বসে যায় সারা রাতের জন্য। আকণ্ঠ মজ্জিত হয়ে স্বর্গে বাস করতে থাকে। সেদিন আর ট্যাক্সি চালানো হয়না। সপ্তাহে এক দু'দিন চলতে থাকে এ স্বর্গবাস। কদম তার স্ত্রী খালেদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় রবিকে।
রবিও কম যায়না। তার নতুন প্রানের বন্ধুকে বাসায় নিয়ে যমুনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, আমার প্রানের বন্ধু। তার মনটা অনেক বড়, তার মত বুকের পাটা আমার আর কোন বন্ধুর নেই। সে অনেক কাজের, অনেক লেখাপড়া জানে। এমন একজন বন্ধু থাকা ভাগ্যের ব্যাপার। তাকে ভালভাবে আপ্যায়ন করতে হবে। কোন ত্রুটি যেন না হয়।
সেই থেকে শুরু হল দু পরিবারের আসা যাওয়া। খালেদা আর যমুনা হয়ে যায় বান্ধবী। যখন তখন দু পরিবার এক হয়, আনন্দ তামাসা করে। তবে খালেদা একটা ফার্স্ট ফুডে কাজ করে বিধায় সব সময় সঙ্গ দিতে পারেনা বলে কদম একাই আনন্দে সামিল হয়। যমুনা কোন কাজ করে না, তার স্কুলে দেবার মত সন্তানও নেই। তাই সারাদিন অলস সময় কাটে। কাটতে চায় না। মাঝে মাঝে এদিক সেদিক ফোনে কথা বলে। সারা রাত একা কাটে। রবি রাতে কাজে করে, দিনে ঘুমায়। তখন যমুনার করার কিছুই থাকে না। রবির আসে পাশে ঘুর ঘুর করে।
একদিন কদম ফোন করল। তার এক বন্ধু এসেছে নিউইয়র্ক থেকে। থাকবে এক সপ্তাহ। বলল, এখনি চলে এস।
কদমের বাসায় গিয়ে বন্ধুর সাথে পরিচয় হল। নাম নসু। তিনজন মিলে অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া চলল। কদমের স্ত্রী অনেক চেষ্টা করে এসব বন্ধ করতে পারেনি। অনেকবার অনেক নির্যাতিত হয়ে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে। খালেদা জানে এখন তিনজন মিলে পান চলবে যতক্ষন তাদের হুঁস থাকে। তারপর একসময় এলিয়ে পড়বে। কেউ হেলে দুলে ঘরে যাবে না হয় এখানেই পড়ে থাকবে। পার্টিশেষে রবি নতুন বন্ধুকে দাওয়াত করে আসল। কাল বিকেলে চলে আসবেন। আমার বাসায় কাল পার্টি হবে।
পরের দিন রবির বাসায় তিনজনের পার্টি হল। অনেক রাতে কদম আর নসু ফিরে এল। আমি সে রাতে আর উঠতেই পারিনি।
এখানে এসে রবি থামল। বোতলটায় আর একটা চুমুক দিয়ে বলল, তখন বুঝিনি। বুঝিনি নসু বার বার কেন রান্না ঘরে গেল। আমার স্ত্রী থাকে পাশের রুমে। রান্না ঘরে গেলে রুমের ভিতর দেখা যায়। দুদিন পর নসু বলল, তোমার বাসায় খেতে যাব। বন্ধু খেতে চায়। বললাম, ঠিক আছে। কাল দুপুরে তোমাদের দাওয়াত। যমুনাকে বললাম। মেহমানদারির যেন কোন ত্রুটি না হয়। খেতে বসে নসু রান্নার অনেক প্রসংসা করল। যমুনার সাথে বেশ সহজ হয়ে গেল। যমুনাও তার সাথে খোলামেলাভাবে কথাবার্তা বলল।
এখন আমাদের তিনজনের দুই বাসায় অবারিত দ্বার। নসু কদম যখন তখন আসে, আমি যখন তখন যাই। এক সপ্তাহ কয়েক সপ্তাহ আগেই চলে গেছে, নসু ফিরে যায়নি।
সেদিন কদম এসে বলল, বাংলা টাউনে একটা দোকান খালি হচ্ছে। একটা ব্যবসা শুরু কর। তোমার কাছে তো বেশ টাকা আছে। ব্যাংকে না রেখে ব্যবসা কর। তারপর একটা হিসাব দিল। কত টাকায় কি ব্যবসা করা যাবে। আমার যে টাকা আছে তা দিয়ে কোন ব্যবসা লাভজনক হবে। যখন বললাম আমার সময় কোথায়? তখন সে যুক্তি দিল, ভাবী তো কিছুই করে না। দোকানে ভাবী বসবে। তারও তো সময় কাটানোর জন্য একটা কিছু চাই। সে তখন যমুনাকে ডাকল। শুনুন তো ভাবী, আপনার জন্য একটা ব্যবসার কথা বলছি। আর রবি রাজি হচ্ছে না।
যমুনা এ কথা শুনে খুব খুশি হল। বলল,তাহলে আমার জন্য ভালই হয়। আমার সময় কাটে না। সুযোগ যখন এসেছে তখন একটা ব্যবসা শুরু কর। রবিকে বলল, তুমি না গেলেও আমি চালাতে পারব। রবি বলতে লাগল, ওরা দুজন আমাকে যেন একটা যাদুর মত করে ফেলল। আমি রাজি হয়ে গেলাম। দোকান নেয়া হল। ব্যবসা করতে হলে কি কি লাগবে, কি করতে হবে সব সাহায্য করল কদম। নসু চলে গেছে নিউইয়র্ক। দোকান নেবার পর সে আবার ফিরে

এল। সেও দোকান সাজাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগল। দেখলাম ওরা দুজনই সব কাজ করছে, আমার খুব একটা প্রয়োজন পড়ছে না। সব ঠিকঠাক করে একদিন উদ্বোধন হয়ে গেল। ব্যবসা শুরু হয়ে গেল।
যমুনা দোকানে বসে, কদম আর নসু তাকে সাহায্য করে। নসু জিনিষপত্র কেনায় সাহায্য করে, এক সময় সে নিউইয়র্ক থেকেও মালামাল কিনে আনল। আর কদম দেখে হিসাব। আমার দু বন্ধু আমাকে সাহায্য করে, আমি খুব খুশি। ব্যবসার শুরুতেই আমাদের কোন লোকশান ছিলনা। কয়েক মাসেই ব্যবসায় বেশ আয় হতে লাগল। **কদম বলল, রবি এ মাসে তোমার লাভ হয়েছে নেট তিন হাজার**। তোমার ব্যবসা খুব ভাল চলছে।
এ কথা শুনে আমি খুশিতে নেচে উঠলাম। যাক, ব্যবসা তাহলে ভালই চলছে। তখন বুঝিনি কোন্ ব্যবসাটা ভাল চলছে। একটু থেমে, বোতলে আর একটা চুমো দিয়ে বলতে লাগল। আমি তখন মনে মনে একটা প্লান করলাম। আর কয়েক মাস ট্যাক্সি চালাব, তারপর ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় বসে যাব। এই কথাটা আমি কদমকে বললাম একদিন। কদম কি ভাবল কে জানে। কয়েক দিন পর নসু আমাকে নিয়ে গেল ডাউন টাউনের একটা বড় হোটেলের নীচে। সেখানে জুয়া খেলা হয়। আমি এসব জুয়াটুয়া খেলিনা। নসু আমাকে বলল, তার পাশে বসে দেখতে। এক সময় নসু আমাকে কিছু টাকা দিল, বলল, একবার লাক ট্রাই করে দেখ। সেখানে বসে এতক্ষন দেখার পর আমারও ইচ্ছা হল খেলতে। নসুর টাকা পেয়ে আমি শুরু করলাম। প্রথম দিকে টাকা চলে গেল, নসু আবার টাকা দিল। তারপর একটার পর একটা জিতে সেদিন আমি পাঁচ হাজার টাকা জিতলাম। আমার আনন্দ দেখে কে? নসু বলল, তোমার ভাগ্য খুব ভাল। তুমি খেললে ভাল করবে। সেই থেকে পেয়ে গেল জুয়ার নেশা। দেখলাম সেখানে খাওয়া দাওয়া পান করার কোন অসুবিধা নাই। যে যা চায় আদেশ করলেই টেবিলে এসে হাজির হয়।
এখন সন্ধ্যা হলেই আমাকে জুয়ার নেশা পেয়ে বসে। নসুকে নিয়ে চলে যাই। বেশ কিছুদিন পর নসু আর যায় না। একটা না একটা কারন দেখিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমি একাই যাই। সেখানেও অনেক বন্ধু জুটে গেছে। দেশি বিদেশি অনেক। টাকা শেষ হয়ে গেলে কোন অসুবিধা হয় না। বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। আবার ফেরত দেই।
এখন আর ট্যাক্সি চালাই না। রাত দুটা তিনটা পর্যন্ত খেলি, তারপর ঘন্টা দুতিন চালাই। বাসায় আসি, কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। বিকালে ঘুম থেকে উঠে দোকানে যাই। দেখি সব ঠিকঠাক চলছে। যমুনা কাউন্টারে থাকে, নসু সব সময় সাহায্য করে। আমি জানতাম না প্রতিদিন নসু সকালে যমুনাকে বাসা থেকে নিয়ে আসে আবার দোকান বন্ধ করে যমুনাকে নিয়ে বাসায় যায়। তুলিকে বেবি সিটারের কাছ থেকে নিয়ে ওরা ঘরে ফিরে। নসু অনেক রাত পর্যন্ত আমার বাসায় কাটায়। কখনও কদমও থাকে।
আমার জুয়াখেলার নতুন বন্ধুরা আমাকে আর টাকা ধার দেয় না। কারন একদিন জিতি তো ছয়দিন হারি। যেদিন হারি সেদিন প্রতিজ্ঞা করি, আর আসবনা। কিন্তু পরের দিন আবার আমাকে চুম্বক টানতে থাকে। চলে যাই আসরে।
এখন আমার টাকার খুব টানাটানি। নসুও বলে দিল টাকা নেই। নিউইয়র্ক না যাওয়া পর্যন্ত তার টাকার ব্যবস্থা হবে না। সেদিন বিকালে দোকানের ক্যাশ বাক্সে হাত দিলাম। যমুনাকে বললাম, হাজার খানেক টাকা দাও, দুএকদিনের মাঝেই ফেরত দিব। তখন নসু পাশেই ছিল । বলল, ক্যাশ থেকে টাকা নিলে মাল কিনা যাবে না। মাল কিনতে না পারলে ব্যবসা চলবে না। আমি বললাম, দুএকদিনের জন্য এমন কিছু হবে না। টাকা নিয়ে চলে গেলাম আসরে। রাত বারটা পর্যন্ত টাকা শেষ। কেউ ধার দিল না। বেরিয়ে গেলাম ট্যাক্সি নিয়ে। প্রতিজ্ঞা করলাম আর আসব না এখানে।
পরের দিন আবার চুম্বকের টানে প্রস্তত হলাম। সামান্য টাকা আছে পকেটে। আরও কিছু না হলে খেলা চলবে না। আবার গেলাম দোকানে। তখনই প্রকাশ হয়ে পড়ল যমুনার আসল রুপ। আট বছর তার সাথে ঘর করার পর তাকে আমি কিছুই চিনতে পারিনি। এই সময় রবির মাথাটা এলিয়ে টুলের উপর পড়ে গেল। তার হাত থেকে বোতলটা গড়িয়ে পড়ল নীচে। তুতলিয়ে তুতলিয়ে কি বলল বুঝা গেল না। আমি ডাকলাম, কি হল রবি। তুমি বেহুস হয়ে গেলে। এখন বাসায় যাবে কি করে? সে কোন উত্তর দিল না। বললাম, একটা ট্যাক্সি ডেকে দিই, তুমি বাসার ঠিকানা বলতে পারবে তো? মনে হল বহু দুর থেকে আধো বাংলায় বলছে, 'হ,দেন'। একটু পর ট্যক্সি এল। তাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, ও কিন্তু বেশি পান করেছে, ঠিক জায়গায় পৌছে দিবেন।
রবির সব কাহিনী শোনা হল না। তবে আবার তাকে যেভাইে হোক খুজে বের করব। তার বাকী কাহিনী শুনব আর আপনাদেরকেও শোনাব।